বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর

অতুল সুর

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

VICHITRA-VIDYA-GRANTHAMALA : 13
BANGLA MUDRANER DUSHO BACHHAR
By Dr. Atul Sur.

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৮৫

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জি জ্ঞা সা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯
১-এ ও ৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীনিরঞ্জনকুমার দাস
শঙ্করনারায়ণ প্রেস
৬এ অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা ৯

১.১

বাংলা নিবন্ধসাহিত্য-প্রচারক্ষেত্রের

দুঃসাহসিক অভিযাত্রী

শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

নিবেদন

আমাদের এক ছাপাখানা ছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়ে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেটা চালু ছিল। সুতরাং আমার প্রথম জীবনে ছাপাখানার কাজ শেখবার সুযোগ ও সুবিধা হয়েছিল। পরে কর্মক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট মুদ্রাকরের সংস্পর্শে আসি, যথা আর্ট প্রেস, ইণ্ডিয়ান প্রেস, লালচাঁদ অ্যাণ্ড সন্স ও শ্রীসরস্বতী প্রেস। এঁদের কর্ণধারদের কাছে ছাপাখানা সম্বন্ধে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেছিলাম।

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘরে থাকাকালীন আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই বইটা লিখি। গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত বই ও নিবন্ধগুলো থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি।

কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৭ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে প্রথম বাক্যটি 'লাইনোটাইপ হচ্ছে এক লাইনের যন্ত্র',—এর পরিবর্তে হবে 'লাইনোটাইপ হচ্ছে একচ্ছত্র যন্ত্র', ৪৮ পৃষ্ঠায় ১৯ ছত্রে '১৮৫৬'-এর পরিবর্তে হবে '১৮৫৭', ৫৫ পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্রে তারাচাঁদ চক্রবর্তী'-র স্থলে হবে 'তারাচাঁদ দাস', ও ৬২ পৃষ্ঠায় ১৯ ছত্রে 'ব্রাহ্মণ সবধি' হবে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'।

দেওঘর

শুক্রবার ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭

অতুল সুর

সূচিপত্র

দ্র. 'গ্রামার'-এর প্রতিলিপির ৪১ সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'র'-এর বিভিন্ন রূপ ও ওই পৃষ্ঠার 'ল'-এর সহিত নামপত্রের 'ল'-এর পার্থক্য লক্ষণীয়। 'ল'-এর এই দুই প্রকার রূপ এক সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পুথিতে। হ্যালহেডের বইয়ে বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে যুক্তাক্ষরসমূহের (যেমন 'ক্ু', 'ন্দ' 'স্তু' ইত্যাদি) রূপ, 'উ'-এর মাথায় চৈতনের পরিবর্তে অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন ও অনুস্বার-এর পরিবর্তে মাথায় ক্ষুদ্র গোলাকার চিহ্নের ব্যবহার।

গ্রন্থপঞ্জী

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা ছাপার হরফ (যুগান্তর, শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৭)।

নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ (পঞ্চদশ ভাগ)।

নববার্ষিকী ১২৮৪—মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র।

নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ)—যখন ছাপাখানা এল।

নিখিল সেন—পুরানো বই।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ও ২য় খণ্ড।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান—বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত—বইয়ের কাহিনী।

সজনীকান্ত দাস—বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস।

সবিতা চট্টোপাধ্যায়—বাংলা গদ্য সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক।

সাহিত্যসাধক চরিতমালা—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুকুমার সেন—বটতলার বেসাতি (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৫)।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান।

A. K. Priolkar—The Printing Press in India.

Carey Exhibition of Early Printing etc. (National Library).

J. C. Marshman—The Life and Times of Carey, Marshman and Ward.

Nathaniel Brassey Halhed—A Grammar of The Bengal Language.

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A

GRAMMAR

OF THE

BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED

AT

HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

হ্যালহেডের 'গ্রামার'-এর নামপত্র

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ ।
বিভুতি ভুসন অঙ্গ জটা তাৰ কেশ ॥

আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া চান্দৰে ।
বিবিধ পুকাৰে রাজা অতি স্তুতি কৰে ॥

সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান ।
এক নিবেদন আমি কৰি তোৰ স্থান ॥

সভা মধ্যে সেনী মোৰে অপমান কৈল ।
জতেক ভুপতি গন বসিয়া দেখিল ॥

অগ্নিবত অঙ্গে দহে সেই অপমান ।
এই নিবেদন আমি কৰি তোৰ স্থান ॥

যদি মোৰে বৰ দিবা দেব পসুপতি ।
মহা ধনুর্দ্ধৰ হঙক আমাৰ সন্ততি ॥

তার পুত্রে মোর পুত্র জিনুক সমৰে ।
রাজা গন মধ্যে জেন অপমান কৰে ॥

ইহা বিনু অন্য বৰ নাহি চাহি আমি ।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি ॥

হ্যালহেডের গ্রামার-এর ৪১ সংখ্যক পৃষ্ঠা

বাংলা হরফের কথা

এক

ঘটনাটা ঘটেছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আট বছর পরে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। ঠিক কোন্ মাসে বা কোন্ তারিখে তা আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে তা সঠিকভাবে জানা না থাকলেও কিছু এসে যায় না। আসল জিনিস হচ্ছে ঘটনাটার গুরুত্ব। গুরুত্বে এরূপ যুগ-প্রবর্তনকারী ঘটনা বাঙলাদেশে পূর্বে ঘটে নি, পরেও না। ঘটনাটার জের প্রথম উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, বাঙলার জনসমাজের সামনে জ্ঞানরাজ্যের ভাণ্ডার, যার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় সংঘটিত হয়েছিল এক নবজাগৃতি।

ঘটনাটা হচ্ছে একখানা বই-এর প্রকাশন। বইখানা হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় রচিত ন্যাথানিয়াল ব্রাশী হ্যালহেড্ কৃত বাংলা ভাষার একখানা ব্যাকরণ। বইখানার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই বইখানাতেই প্রথম বিচ্ছিন্ন নড়নশীল (movable types) বাংলা হরফের চেহারা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বইখানা আটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এতে বাংলা বর্ণমালা, অক্ষফলা, বানান, উচ্চারণ হতে আরম্ভ করে, বিশেষ্যের লিঙ্গ-বচন-কারক, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, সংখ্যাবাচক-পূরণবাচক-পরিমাণবাচক শব্দপদতত্ত্ব, বাক্যরীতি ও বাংলা ছন্দ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছিল। তা ছাড়া বইখানাতে বাংলা হরফে উদ্ধৃত হয়েছিল রামায়ণ, মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর ও প্রচলিত পাঁচালিসমূহের অংশবিশেষ— বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম ও প্রয়োগ বোঝাবার জন্য। ব্যাকরণখানা থেকে হ্যালহেডের সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, ফারসি, আরবি, হিন্দুস্থানি ও বাংলা ভাষার ওপর অসাধারণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়। পোতুর্গীজ পাদরি মানোএল-দ্য-আসসুম্পসাঁম ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান হরফে একখানা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু হ্যালহেডের ব্যাকরণই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।

হ্যালহেডের বইখানার পরিশিষ্টে তৎকালীন বাংলা হাতের লেখার একটা প্রতিলিপি ও বাংলা ছাপার হরফে মুদ্রিত তার অনুলিপিও দেওয়া হয়েছিল।

এই হাতের লেখার প্রতিলিপিটা ছিল কাকজোল (প্রাচীন কজঙ্গলের অপভ্রংশ) পরগনার জমিদার জগৎবীর রায়-কর্তৃক লিখিত একখানা আরজি-পত্র। এই আরজি-পত্রের তারিখ হচ্ছে ১১৮৫ সালের ১১ই শ্রাবণ বা ২৮শে জুলাই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। বইটার প্রকাশনের তারিখ নির্ণয়ে এই তারিখটা আমাদের সাহায্য করে। এই তারিখটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বইখানা ছাপা হয়েছিল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালের দিকে। লেখক বই বাঁধাইকারকদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা থেকেও এটা সমর্থিত হয়। ওই নির্দেশে বলা হয়েছে যে যেহেতু বইখানা বর্ষাকালে ছাপা হয়েছে, সেহেতু বইখানা যেন পরের বছরের গ্রীষ্মকালের আগে বাঁধাই করা না হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বইটা ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু বইখানার নামপত্রের ওপর ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ছাপা আছে। সুতরাং প্রকাশের তারিখ হিসাবে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। যদিও আসলে বইখানা প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে। তবে বইখানা ছাপতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগেছিল। কেননা, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বইখানার প্রথম ১০০ পাতা বিলাতে কর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

দুই

এইবার বইখানার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙলাদেশে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরেজরা দেখল যে দেশ শাসন করতে হলে দেশের ভাষা শেখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তখন গভর্নর জেনারেল। কোম্পানির সিভিলিয়ানদের মধ্যে কাকে দিয়ে বাংলা ভাষার একখানা ব্যাকরণ লেখানো যায়, তারই তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। দেখা গেল এই কাজের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন ন্যাথানিয়াল ব্রাশী হালহেড্ (১৭৫১-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ) নামে কোম্পানির একজন সিভিলিয়ান কর্মচারী। কোম্পানির কর্মচারীরা যাতে ভালভাবে বাংলা ভাষা শিখতে পারে, তার জন্য ইংরেজি ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার একখানা ব্যাকরণ তৈরি করবার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হল। বইখানা শীঘ্রই লিখে ফেলা হল এবং বইখানার নাম দেওয়া হল 'এ গ্রামার অভ্ দি বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ'। নামপত্রের

মাথায় একথাও লেখা হল যে বইখানা ফিরিঙ্গিদের উপকারার্থে লেখা। কিন্তু সমস্যা উঠল, বইখানা ছাপানো হবে কি ভাবে। বাংলা হরফ ছাড়া তো বইখানা ছাপানো সম্ভবপর নয়। কিন্তু বাংলা হরফ তখন কোথায়? ছাপাখানার উপযোগী বাংলা হরফের তো তখনও জন্ম হয় নি। সুতরাং বাংলা হরফ কিভাবে তৈরি করা যেতে পারে সেটাই হল প্রধান চিন্তা। হ্যালহেড্ প্রথমে বোলট্স্ (Bolts) নামে বিলাতে অবস্থিত এক সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। বোলট্স্ পূর্বে এদেশেই ছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা থেকে একখানা খবরের কাগজ বের করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এটা সরকারের মনঃপুত না হওয়ায় সরকার বোলট্স্‌কে এদেশ থেকে বিলাতে নির্বাসিত করেছিল। বোলট্স্ ভাল বাংলা জানতেন। তা ছাড়া হরফ তৈরি সম্বন্ধে তাঁর বেশ কিছু জ্ঞানও ছিল। এটা মনে হয় তাঁর ধমনীতে ওলন্দাজ রক্তের প্রভাব। বিলাতে ক্যাস্‌লনের বিখ্যাত হরফ তৈরির কারখানার জোসেফ জ্যাক্সন নামে জনৈক শিক্ষানবীশের সহায়তায় তিনি বাংলা হরফ তৈরির প্রচেষ্টাও করেছিলেন। হ্যালহেড্ এসব কথা জানতেন এবং সেই কারণেই তিনি বোলট্স্-এর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বোলট্স্ বিলাতি মিস্ত্রি দ্বারা এক প্রস্থ বাংলা হরফ তৈরি করাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস এদেশে অবস্থিত চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্‌স্ (১৭৪৯-১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) নামে কোম্পানির অপর একজন সিভিলিয়ানকে বাংলা হরফ কর্তনের অনুরোধ জানান। উইল্‌কিনস্ ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। সংস্কৃত, বাংলা এবং এদেশের অন্যান্য ভাষায়ও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পরে ওয়ারেন হেষ্টিংসের উৎসাহে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভগবদ্‌গীতা'র এক ইংরেজি অনুবাদ বের করেছিলেন। এটাই প্রথম সংস্কৃত গ্রন্থ যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস জানতেন যে উইল্‌কিন্‌স্ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলা হরফের দু-একটা ছেনি (punch) তৈরি করেছিলেন। এটা হেষ্টিংসের জানা ছিল বলেই, তিনি উইল্‌কিন্‌স্‌কে হ্যালহেডের বই ছাপাবার জন্য বাংলা ছাপার হরফ তৈরি করবার ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উইল্‌কিন্‌সের সঙ্গে হ্যালহেডেরও বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং বন্ধুর বই ছাপার জন্য হরফের প্রয়োজন, এই জেনে তিনি হরফ কর্তনের (Punch-cutting) কাজে প্রবৃত্ত হন। তিনি নিজের হাতেই ছেনি ধরলেন এবং বাংলা অক্ষর

কর্তন ও হরফ ঢালাইয়ের কাজ সমাধা করলেন। এইভাবেই ছাপাখানায় ব্যবহারযোগ্য বাংলা হরফের প্রথম জন্ম হল। হ্যালহেড্ তাঁর বাংলা ব্যাকরণ পুস্তকের ভূমিকায় লিখে গেছেন যে উইল্‌কিনস্ নিজের চেষ্টাতেই স্বয়ং বাংলা অক্ষর কর্তন ও হরফ ঢালাইয়ের কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হ্যালহেডের ব্যাকরণের ভূমিকার এই অংশটি বাংলা ছাপাখানার ইতিহাসে খুব মূল্যবান।

উইল্‌কিনস্‌ই যে বিচ্ছিন্ন নড়নশীল বাংলা হরফ তৈরির জনক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ দেশের একটা মহৎ উপকার সাধন করে গেছেন। পঞ্চানন কর্মকার নামে এদেশের একজন দক্ষ ও প্রতিভাশালী শিল্পীকে তিনি হরফ তৈরির প্রণালীটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। পঞ্চানন উইল্‌কিনস্-এর যোগ্য উত্তরসূরী হয়েছিলেন। পরবর্তী কালের বাংলা হরফের সাট বিবর্তনের ইতিহাসে পঞ্চাননের ও তাঁর পরিজনদের প্রয়াস ও দান অনন্য সাধারণ।

হুগলিতে উইল্‌কিনসের সহযোগী পঞ্চাননের সঙ্গে আর একজন দাবিদারও আছে। নাম তার শেফার্ড। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশনারিরা উইল্‌কিনসের সহযোগী হিসাবে পঞ্চাননেরই নাম করে গিয়েছেন।

তিন

উইল্‌কিনসের কাছ থেকে পঞ্চানন হরফ তৈরির যে কারিগরিবিদ্যা (টেকনোলজি) শিখেছিলেন সেটা কি এবং সেটার উদ্ভবই বা কোথায় হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। পৃথক পৃথক হরফ সাজিয়ে ছাপার ব্যাপারে চীনদেশই হচ্ছে সকলের অগ্রজ। চতুর্দশ শতাব্দীতে চীন ও কোরিয়ার লোকেরা ছাপার জন্য বিচ্ছিন্ন হরফ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে সে চেষ্টা ছিল সীমিত। সেটা তখনকার হরফের আধার (case) থেকেই বুঝতে পারা যায়। তখন এখনকার মতো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট আধার হত না। হরফগুলো রাখা হত একটা ডিম্বাকার আধারে। আধারটির প্রান্তভাগে এক সারি ঘর থাকত ও ওই সারির সমান্তরালে মধ্যভাগে ডিম্বাকারে রচিত আর এক সারি ঘর থাকত। কিন্তু চীন-ভাষায় ছাপার জন্য অসংখ্য (প্রায় ৪০,০০০) হরফের প্রয়োজন হয় বলে, এই সীমিত হরফমালা কিছু কাজে লাগে নি।

যদিও বিচ্ছিন্ন হরফ চীন ও কোরিয়াতেই প্রথম তৈরি হয়েছিল, তা হলেও তার সঙ্গে ইওরোপে এরূপ হরফ তৈরির কোন সম্পর্ক ছিল না। ইওরোপে এর উদ্ভব হয়েছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে। ইওরোপীয় টেকনোলজিই বাংলায় অনুসৃত হয়েছিল।

এবার এই টেকনোলজিটার কথা কিছু বলা যাক। বিচ্ছিন্ন হরফ তৈরির যে ক'টি ধাপ আছে, তা এক এক করে বলে যাচ্ছি। প্রথম একখণ্ড লম্বা ইস্পাত টুকরার মাথার দিকে ছেনি দিয়ে একটা বিশেষ অক্ষরের প্রতিলিপি কাটা হয়। অক্ষরের প্রতিলিপিটা উঁচু (relief) হয়ে থাকে। এই ইস্পাত খণ্ডকে পাঞ্চ (punch) বলা হয়। পরে পাঞ্চটাকে কঠিন করা হয় ও ওর যে অংশে অক্ষরটি কাটা হয়েছে সেটিকে নরম কোন ধাতুর (সাধারণতঃ তামা বা পিতল) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এর ওপর যে ছাপ তোলা হয় তাকে ম্যাট্রিকস্ (matrix) বলা হয়। তারপর এই ম্যাট্রিকস্‌টা একটা ছাঁচের (mould) এক প্রান্তে লাগান হয়। ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের প্রস্থ অনুযায়ী এই ছাঁচটিকে কমবেশি করা (adjust) যায়। এই ছাঁচের মধ্যেই হরফটিকে ঢালাই করা হয়। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি সীসার হরফ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধাতুটি খাঁটি সীসা নয়। এটা একটা সঙ্কর ধাতু—সীসা ও টিনের মধ্যে কিছু পরিমাণ অ্যান্টিমনি (antimony) বা বিসমাথ (bismuth)-এর খাদ মিশিয়ে এটা তৈরি করা হয়। এই সঙ্কর ধাতুটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর গলনাঙ্ক খুব কম ও বেশ দৃঢ়তা-বিশিষ্ট। এর আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে অন্য সঙ্কর ধাতুর মতো এটা ছাঁচের মধ্যে সংকুচিত বা ঘনীভূত হয় না। তার ফলে ম্যাট্রিকস্ থেকে ঠিক হুবহু হরফের মাথায় ছাপ পাওয়া যায়। বর্তমানে হরফ তৈরির কারখানাসমূহে যে সঙ্কর ধাতু ব্যবহার করা হয় তাতে সীসা থাকে মাত্র ৭০ শতাংশ।

এই প্রণালীতেই প্রথম হরফ তৈরি করা হয়েছিল ইওরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তার আগে ছাপার কাজ কাঠের ওপর খোদাই করা ব্লকের সাহায্যে হত। কে যে ইওরোপে প্রথম হরফ তৈরি করেছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বস্তুত গত পাঁচ শতাব্দী ধরে এই নিয়ে যথেষ্ট বাদবিতণ্ডা ও বই লেখা হয়েছে। এক মত অনুযায়ী প্রণালীটা প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল হল্যাণ্ডে লরেন্স্ জানজুন (ওরফে কস্টার) কর্তৃক এবং তার এক কর্মচারী প্রণালীটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল

জারমানিতে। অপর মত হচ্ছে এটা জারমানিতেই ইয়োহা গুটেনবার্গ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল, এবং তিনিই প্রথম বিচ্ছিন্ন হরফ সাজিয়ে প্রতি পাতায় ৪২-ছত্রে মুদ্রিত একখানা বাইবেল প্রকাশ করেছিলেন। যা হোক, গুটেনবার্গের সপক্ষেই মতবাদ বেশি প্রবল। গুটেনবার্গের বাইবেল ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মেইনস্ শহরে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু মুদ্রাকর হিসাবে এটাতে গুটেনবার্গের নাম ছিল না। মুদ্রাকরের নামাঙ্কিত প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এটাতে নাম ছিল গুটেনবার্গের দুজন সহকারী—ফুস্ট (Fust) ও সোয়েফার (Schoeffer)-এর। কিন্তু এর অব্যবহিত পরে হল্যাণ্ডই হরফ তৈরির পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায় ও সেখান থেকেই হরফ ইংলণ্ডে ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে যায়।

চার

যদিও বিচ্ছিন্ন ও নড়নশীল হরফ তৈরি ইওরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়েছিল, তাহলেও বিচ্ছিন্ন নড়নশীল বাংলা হরফ তৈরি হতে সময় লেগেছিল আরও ৩২৩ বছর। তার আগে অবশ্য পাঁচ ছয় খানা বাংলা বই রোমান হরফে ছাপা হয়েছিল। সেগুলো বের করেছিল পোর্তুগীজরা লিসবন শহর থেকে।

আগেই বলা হয়েছে যে হুগলিতেই চার্লস উইল্কিন্স্ বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই হরফেই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল হ্যালহেডের ব্যাকরণ। উইল্কিন্স্ এই বইটা ছাপবার জন্য যে বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন, তাতে তাঁর হাতের কাজের যথেষ্ট নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছিল। তা ছাড়া, প্রথম সৃষ্ট বাংলা হরফ হলেও, দেখতে সেগুলি সুন্দর ছিল। অবশ্য আমি প্রথম প্রয়াস হিসাবেই তার সৌন্দর্যের কথা বলছি। ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে যে একই হরফের জন্য তিনি একাধিক 'পাঞ্চ' কেটে ছিলেন। আরও বুঝতে পারা যায় যে বোধ হয় দুই ভিন্ন হাতে পাঞ্চগুলি কাটা হয়েছিল। অবশ্য এটা খালি চোখে দেখলেও বুঝতে পারা যায়। বইটির ৪১ সংখ্যক পৃষ্ঠায় বাংলা কাব্যের যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তার প্রথম ১২ ছত্রে যেখানেই 'র' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেই পেটকাটা 'ব' অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তার পরের চার ছত্রে 'র' অক্ষরটি নয়বার ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে দুবার পেটকাটা 'ব' ও সাতবার তলায়

বিন্দুযুক্ত 'র' ব্যবহার করা হয়েছে। বইটার অন্যান্য পাতাতেও ঠিক তাই। এখানে বলা প্রয়োজন যে বাঙলার প্রাচীন পুথি ও শিলালিপি সমূহ পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে লেখকের অভিরুচি অনুযায়ী দু-রকমের 'র'-ই বাঙলাদেশে ব্যবহৃত হত। সুতরাং হ্যালহেডের বইয়ে দুরকম 'র'-এর ব্যবহার দেখে মনে হয় যে একাধিক হাতে ইস্পাতখণ্ডের ওপর ছেনি কেটে বিভিন্ন রকম ম্যাট্রিকস্ তৈরি করে 'র' শব্দটি ঢালাই করা হয়েছিল। এ ছাড়া, এর আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন ম্যাট্রিকস্ ব্যবহার করা হলেও, অক্ষরগুলি সুন্দর ও স্পষ্ট। পরবর্তী ছাপা বই জোনাথন ডানকান কর্তৃক রচিত 'রেগুলেশন্স্ ফর দি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অভ্ দি জাষ্টিস্ ইন দি কোর্ট অভ্ দেওয়ানি আদালত' যা ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনারেবল কোম্পানির ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছিল, তার হরফগুলি কিন্তু অন্য সাটের। তবে এই বইয়েতেও তলায় বিন্দুযুক্ত 'র'-এর পরিবর্তে পেটকাটা 'ব'-ই ব্যবহৃত হয়েছে। উইল্‌কিন্স্ এ সময় অনারেবল কোম্পানির ছাপাখানার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। দুটি বইয়েতেই পেটকাটা 'ব'-এর ঐক্য দেখে, আমরা যদি এই সিদ্ধান্ত করি যে হুগলিতে 'র'-এর পরিবর্তে পেটকাটা 'ব'-এর ছেনি কেটেছিলেন চার্লস উইল্‌কিন্স্ নিজে, আর বিন্দুযুক্ত 'র'-এর ছেনি কেটেছিলেন তাঁর শিষ্য পঞ্চানন, তা হলে আমাদের অনুমানটা কি একেবারে বাজে হবে? এর সপক্ষে যে যুক্তি আছে, তা হচ্ছে এই যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকে পঞ্চানন শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারিদের ছাপাখানায় কাজ করতে আরম্ভ করে। সুতরাং শ্রীরামপুরের বাংলা হরফের সাট পঞ্চাননই তৈরি করেছিল। এই সাটে তলায় বিন্দুযুক্ত 'র'-ই ব্যবহৃত হয়েছিল।

পাঁচ

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু তার আগেই কলকাতা থেকে কয়েকখানা বই প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয়েছিল। এদের মধ্যে একখানির কথা আমরা আগেই বলেছি। এখানি হচ্ছে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জনাথন ডানকান-অনূদিত 'রেগুলেশনস্ ফর দি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অভ্ দি জাষ্টিস ইন দি কোর্ট অভ্ দেওয়ানি আদালত'।

আর একখানি হচ্ছে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এইচ. পি. ফরষ্টার-অনূদিত ‘কর্নওয়ালিস্ কোড’। আর একখানি ওই সালেই প্রকাশিত এ. আপজন কর্তৃক রচিত ‘ইংরাজি-বাঙ্গালি বোকেবিলরি’। আর একখানি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন মিলার-কৃত ‘সিক্ষ্যাগুরু’। আরও একখানি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ফরষ্টার-রচিত ‘ভোকাবুলারি’। প্রথম দুখানি বইয়ের হরফ হুগলিতে ছাপা হ্যালহেডের ব্যাকরণের হরফের কাছাকাছি, যদিও সাটের তফাৎ ছিল। বাকিগুলির হরফ হুগলির এবং কলকাতার অনারেবল কোম্পানির ছাপাখানার মতো নয়। এগুলির মধ্যে যথেষ্ট বিরূপতা ছিল। সেজন্য মনে হয়, এ হরফগুলির সাট অন্য কেউ তৈরি করেছিল। সে কে? নিশ্চয়ই উইল্‌কিন্‌স্ বা পঞ্চানন নন। কেননা, এগুলির মধ্যে কাঁচা হাতের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’ ও ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ’ ও ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্’-এর হরফ হুগলিতে ছাপা হ্যালহেডের ব্যাকরণের মতো অত সুন্দর নয়। কিন্তু আমরা যখন শ্রীরামপুরের ছাপা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ‘আইন’ ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’-র দিকে তাকাই, তখন আমাদের মনে হয় যে আমরা যেন বাংলা হরফের বর্তমান যুগের মধ্যে এসে পড়েছি। এসব সাট মনে হয় পঞ্চাননের জামাতা মনোহরের বা মনোহরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের হাতের তৈরি। (কেননা, পঞ্চানন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা গিয়েছিল)। এই সব সাটগুলির মধ্যে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে দুখানা সাময়িক পত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। একখানির নাম ‘দিগ্‌দর্শন’ ও অপরখানি হচ্ছে বিখ্যাত ‘সমাচারদর্পণ’। দুখানাতেই শ্রীরামপুরের পূর্বোক্ত সাট ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহর থেকে প্রকাশিত চণ্ডীচরণ মুন্সী-রচিত ‘তোতা ইতিহাস’-এর হরফে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। এ সাটটি যথেষ্ট টেকনোলজিক্যাল নিপুণতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করছে।

ছয়

এতক্ষণ আমরা হরফ সম্বন্ধেই বলছিলাম। তাদের স্রষ্টাদের বিষয়ে বা প্রথম বাংলা মুদ্রণের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের বিষয়ে খুব কমই বলেছি। প্রথমেই আমাদের ন্যাথানিয়াল ব্রাশী হ্যালহেডের কথা বলতে হয়, কেননা তিনিই ছিলেন বাংলা হরফ তৈরির উপলক্ষ। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ মে তারিখে লণ্ডনের ওয়েষ্ট-মিনষ্টার অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়। পিতা উইলিয়াম হ্যালহেড ছিলেন 'ব্যাঙ্ক অভ্ ইংলণ্ড'-এর একজন ডিরেকটর। হ্যারোতে (Harrow) শিক্ষাকালে বিখ্যাত নাট্যকার ও বাগ্মী শেরিডান ন্যাথানিয়ালের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেড ও শেরিডান উভয়ে মিলে গ্রীক গল্পলেখক এরিষ্টেনেটাস-এর লেখা প্রণয়-পত্রসমূহ ইংরেজি পদ্যে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ওই পদ্যানুবাদের নামপত্রের প্রথমেই হ্যালহেডের নাম ও পরে শেরিডানের নাম ছিল। ('The love letters of Aristaenetus' translated by N. B. Halhed and R. B. Sheridan)। তিনি 'জুপিটার' (Jupiter) নামে একখানা প্রহসনও রচনা করেছিলেন। অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি উইলিয়াম জোনসের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর প্রেরণাতেই প্রাচ্যভাষাসমূহ শিক্ষা করেন। এলিজাবেথ অ্যান লিনলে নামে এক পরমা সুন্দরী মেয়ের প্রণয়প্রার্থী ছিলেন শেরিডান ও হ্যালহেড উভয়েই। কিন্তু শেরিডানের সঙ্গে তার বিয়ে হবার পর, হ্যালহেড্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতে চলে আসেন। এখানে তিনি চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্নরের মেয়ে হেলেনা রিবাউটকে বিয়ে করেন।

গোড়া থেকেই তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ও তাঁর নির্দেশে ১৭৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে Gentoo Code প্রকাশ করেন। পরে তিনি হেষ্টিংস-এর নির্দেশে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তাঁর যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল, তা তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তা থেকে প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছিলেন—"বাংলা ভাষার শব্দগৌরব অসীম। বাংলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি যে কোন বিষয় রচিত হতে পারে। কিন্তু বাঙালিরা এ বিষয়ে যত্নশীল নন।" মনে হয় হ্যালহেডের পরিবারে রীতিমত বাংলা চর্চা ছিল। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ন্যাথানিয়াল জন হ্যালহেড্ সদর দেওয়ানি আদালতের জজ

ছিলেন। কিন্তু তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন অসাধারণভাবে বাংলা কথ্যভাষা আয়ত্তের জন্য। তিনি অ-পেশাদারি কবিওয়ালাও ছিলেন। একবার তিনি বর্ধমানের রাজবাটীতে এদেশি পেশাদার কবিওয়ালাদের সঙ্গে এমনভাবে লড়ে গিয়েছিলেন যে কেউ বুঝতে পারে নি যে তিনি বাঙালি নন।

বস্তুতঃ পলাশি যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা ভাষা শিখেছিল। তাদের মধ্যে কাসিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেব একজন। এই ওয়াটস্ সাহেবের বাংলা ভাষাজ্ঞান দেখেই ক্লাইভ কোম্পানির সিভিলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথম বিলাতের কোর্ট অভ্ ডিরেকটর-দের কাছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে একখানি পত্র লেখেন। ওই পত্রের দ্বিতীয় প্যারায় তিনি লেখেন—"ওয়াটস্ সাহেব আমার সঙ্গে আছেন বলে, আমি বিশেষ উপকৃত বোধ করছি। তিনি বহুদিন এদেশে বাস করছেন। বাঙালির রীতি-প্রকৃতি ও ভাষাজ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট। কোম্পানির প্রধান কর্মচারিগণের এরূপ এদেশীয় ভাষাজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য।" এই প্রয়োজনীয়তা মেটাবার জন্যই ওয়ারেন হেষ্টিংস সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং হ্যালহেডকে দিয়ে তা রূপায়িত করেছিলেন।

এবার চার্লস উইল্‌কিন্‌স্ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক, কেননা বাংলা হরফ তৈরির তিনিই জনক। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ বছর বয়সে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে রাইটার-এর চাকরি নিয়ে এদেশে আসেন। তীক্ষ্ণ মেধাবিশিষ্ট এই যুবক এদেশে আসবার অল্পকালের মধ্যেই ফারসি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গোড়া থেকেই তিনি এসব ভাষার হরফ তৈরি করবার চেষ্টা করতে থাকেন। ক্রমে হরফ নির্মাণ ও মুদ্রণশিল্পে তিনি বিশেষজ্ঞ হন। এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ বলেই গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁকে হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপাবার জন্য বাংলা হরফ তৈরি করতে অনুরোধ জানান। আগেই বলেছি যে উইল্‌কিন্‌স্ এ কাজে সাফল্য লাভ করেন এবং তাঁর তৈরি বাংলা হরফ দিয়েই হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপা হয়। এই কার্যসমাধার জন্য হ্যালহেড ও উইল্‌কিন্‌স্ উভয়ে ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কোম্পানির প্রেসের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই তত্ত্বাবধানে মালদহে ফ্রান্‌সিস্ গ্লাডউইন-সংকলিত বিখ্যাত

ইংরেজি-ফারসি অভিধান ছাপা হয়। পরে তিনি দেবনাগরী হরফও তৈরি করেছিলেন। সংস্কৃতভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভগবদ্গীতা'র প্রথম অনুবাদ বের করেন। 'মনুসংহিতা'-র অনুবাদও তিনি আরম্ভ করেছিলেন, যদিও উইলিয়াম জোনস্ (১৭৪৬-৯৪) তা শেষ করেন। এছাড়া উইল্‌কিন্‌স্ সংস্কৃত 'হিতোপদেশ'-এরও অনুবাদ করেছিলেন। কয়েকটি শিলা-লিপি ও তাম্রপট্টের পাঠোদ্ধারও তিনি করেছিলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি একখানা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ও ধাতুরূপ সম্বন্ধে আর একখানি বইও লিখেছিলেন। স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতে ফিরে যান। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউস সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও আমৃত্যু (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 'এসিয়াটিক রিসার্চ জর্নাল'-এ তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ আছে।

পঞ্চানন কর্মকারই ছিলেন উইল্‌কিন্‌সের সুযোগ্য শিষ্য। তাঁর বাড়ি ছিল হুগলির নিকট বড়া গ্রামে (মতান্তরে জিরাট বলাগ্রাম ও পরে বাঁশবেড়িয়া)। সবিতা চট্টোপাধ্যায় পঞ্চাননের একটা বংশপীঠিকা দিয়েছেন। তা থেকে দেখা যায় পঞ্চাননের পঞ্চম উর্ধ্বতন পুরুষের নাম ছিল রাধাকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের পুত্র আনন্দ, আনন্দের পুত্র নিমাই, নিমাইয়ের পুত্র শম্ভুনাথ ও শম্ভুনাথের দুই পুত্র গদাধর ও পঞ্চানন। পঞ্চাননের পরিবারের ইস্পাত, লোহা ও তামার ওপর লিপিকরণে বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা ছিল। শিষ্য ও সহকর্মী হিসাবে তিনি উইল্‌কিন্‌সের বাংলা হরফ তৈরিতে সাহায্য করেন। পরে তিনি উইল্‌কিন্‌সের কাছ থেকে দেবনাগরী ও ফারসি অক্ষর খোদাই শিখে তার উন্নতি বিধান করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় এক হরফ ঢালাই কারখানা স্থাপন করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকে (মার্চ মাস থেকে) তিনি শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনারিদের ছাপাখানায় কাজ করতে আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুরের পাদ্রি উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) তাঁকে দিয়ে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগরী অক্ষরের একটা সাট তৈরি করান। ভারতবর্ষে নাগরী হরফ নির্মাণ এই প্রথম। শ্রীরামপুরে বাংলা হরফেরও তিনি একটি সাট তৈরি করেন। উইল্‌কিন্‌সের তৈরি হুগলির সাটের তুলনায় এই সাটের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্রীরামপুরে

একদল মিস্ত্রিকে পঞ্চানন হরফ তৈরির কাজ শেখান। ত্রিবেণী-নিবাসী মনোহরও তাদের মধ্যে ছিল। পঞ্চানন তাঁর একমাত্র সন্তান কন্যা লক্ষ্মীমণির সঙ্গে মনোহরের বিবাহ দেন। শ্রীরামপুরে আসবার পর পঞ্চানন বেশিদিন কাজ করতে সক্ষম হন নি। শ্রীরামপুরে আসবার তিন চার বছর পরেই (১৮০৩ বা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তিনি ভারতের বিভিন্ন বর্ণমালায় হরফ তৈরি করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা মনোহর ও অন্যান্য মিস্ত্রিরা এই কাজে হাত লাগান। আঠারো বছরের মধ্যে তাঁরা চৌদ্দটি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার হরফ তৈরি করেন। মনোহর চল্লিশ বছরেরও বেশিকাল শ্রীরামপুরে কাজ করেছিলেন। তাঁর ছেলে কৃষ্ণচন্দ্রও টাইপ তৈরির কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখায়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সত্তর বছর কাল বাংলাদেশে হরফ তৈরির কাজে একটা পরিবারেরই প্রাধান্য ছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'সত্যপ্রদীপ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা এই পরিবারের প্রতি তাঁদের যে গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছিলেন, তা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে প্রকাশ পায়।

"কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী। আমরা অত্যন্ত খেদ পূর্বক উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোক প্রাপ্তির সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা অতি প্রসিদ্ধ মনোহর মিস্ত্রী। পিতাপুত্র দুইজন অক্ষর ও প্রতিবিম্ব ক্ষোদনের বিদ্যাতে সুপটু। তাঁহারা যে প্রকার প্রসিদ্ধ হয়েন তদ্বিষয়ে কিছু লিখি। ইঙ্গরাজলোক কর্তৃক এই দেশ অধিকৃত হওনের পরও অনেক বৎসর পর্যন্ত কোন বাঙ্গলা পুস্তক ছাপা হয় নাই। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড সাহেব বাঙ্গলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করনান্তর তদ্ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করনেচ্ছুক হইলেন। পরন্তু বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে না জানা প্রযুক্ত উক্ত সাহেবের বন্ধু অতিপটু শিল্পকর্ম্মি উইলকিনস্ সাহেব স্বহস্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোদন করিয়া ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। তৎকালিন কোনক্রমে মনোহর মিস্ত্রীর শ্বশুর পঞ্চানন মিস্ত্রীর সঙ্গে উক্ত উইলকিনস্ সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহেব তাহাকে বিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদন করিবার শিক্ষা দিলেন। অনন্তর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক কেরী সাহেব ও মার্শমান সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে বাসকরন পূর্বক

যন্ত্রালয় স্থাপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিস্ত্রী তাঁহাদের নিকট কর্ম পাইয়া বাঙ্গলা ও দেবনাগর ও উড়িয়া প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় ধর্মপুস্তক প্রকাশার্থ তত্তদ্ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিলেন। তাঁহার মরণান্তর, জামাতা মনোহর মিস্ত্রী তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ গুণবান প্রযুক্ত ন্যূনাধিক পঞ্চদশ ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চত্বারিংশৎ সহস্র অক্ষরঘটিত চীনভাষার অক্ষর কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন। ঐ মনোহর মিস্ত্রী আপনার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় কর্ম শিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে (১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বৎসরে ২ পঞ্জিকা ও বাঙ্গলা ইঙ্গরাজি নানা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ সালে (১৮৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) লোকান্তরগত হন। তৎপরে কৃষ্ণচন্দ্র বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাঙ্গলা ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার পুস্তক ও ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ পিতা ও মাতামহ অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্পকর্মেতে অতি পটু। সীসার উপর ক্ষোদনে যেমন পারগ তেমনও কাষ্ঠে প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণরৌপ্যাদির অতি সূক্ষ্মকর্মঘটিত অলঙ্কার নির্মাণ করিতে পারগ। পঞ্জিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিম্ব তাঁহার স্বহস্তে ক্ষোদিত হয়। আরো ব্যক্ত আছে অতি প্রেয়সী ভার্যার নিমিত্তে তিনি অপূর্ব স্বর্ণময় এক হার নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার তুল্য সুরচিত প্রায় ধনাঢ্যের বাটিতেও দুষ্প্রাপ্য। আরো তিনি নিজ বুদ্ধিমতে এক লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়া তদ্দ্বারা পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন। পরন্তু সুপটু সুরচক সুশীল হইলেও কালের ক্ষমা-পাত্র কে? গত শুক্রবার কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী সুস্থাবস্থায় আমাদের যন্ত্রালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই দিবসে রজনী যোগে তাঁহার ওলাউঠার লক্ষণ হইয়াছিল। রাত্রাবসানে অত্যন্ত তৃষ্ণাপ্রযুক্ত অধিকতর সুশীতল জল পান করনান্তর বাকরোধ হইল ও অনবরত অনিবারিত কালঘর্ম হইতে লাগিল। তাহাতে রীতিমত ঔষধ সেবন করিয়াও রবিবারের প্রাতঃকালে কালগ্রস্ত হইলেন। বয়স তেতাল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। অতি আক্ষেপের বিষয় এই তাঁহার শোকানল সন্তাপিনী বৃদ্ধা জননী ও সাধ্বীরমণী আছেন। পুত্রকন্যা মাত্র নাই। প্রত্যাশা রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র নামক তদীয় সহোদরদ্বয় বর্তমান। তাঁহারা কর্মক্ষম বটেন।" —'সত্যপ্রদীপ', ২৫ মে ১৮৫০ শনিবার।

কিন্তু বর্তমানে মনোহরের বংশের কেহই পূর্বপুরুষের জীবিকা গ্রহণ করেন নি, মুদ্রণশিল্পের সঙ্গেও তাদের কারুর সম্পর্ক নেই।

সাত

তবে পঞ্চানন-গোষ্ঠীর শিল্পধারা পরবর্তী কালে একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের বংশও পঞ্চাননের কাছ থেকে এই নতুন বিদ্যা শিখে নিয়েছিল। গদাধরের বংশধরদের মধ্যে একজন অধরচন্দ্র কর্মকার নিজেই একটা টাইপ ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন অধর টাইপ ফাউণ্ডারি। অধরের পর রামচন্দ্র ওই কারখানার মালিক হন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এই কারখানা চালু ছিল। কেননা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে 'বিশ্বকোষ'-এ লিখিত হয়েছিল—"অধরচন্দ্র কর্মকারের কার্যালয়ের ঢালাই বর্জাইস্, স্মল পাইকা, পাইকা ও ইংলিশ ছাঁদের হরফগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর। বিভিন্ন মুদ্রাকরগণ উক্ত ছাঁদসমূহের ইলেকট্রো-ম্যাট্রিকস্ প্রস্তুত করিয়া কার্য চালাইতেছেন।" তা হলে দেখা যাচ্ছে যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত পঞ্চাননের ভাইয়ের বংশধররা টাইপ প্রস্তুত-শৈলীর ধারা বজায় রেখেছিল। ইতিমধ্যে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা হরফের একটা মান স্থির করে দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য অনেক নতুন নতুন টাইপ ফাউণ্ডারি স্থাপিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই শিবনারায়ণ দাস লেনে একটা টাইপ ফাউণ্ডারি ছিল। সেটা রক্ষিতদের টাইপ ফাউণ্ডারি নামে পরিচিত ছিল। গৌরমোহন আঢ্য নামে এক ব্যক্তি (ইনি নাট্যকারও ছিলেন) চিৎপুর রোডে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের পিছনে একটা টাইপ ফাউণ্ডারি স্থাপন করেছিলেন। ওই টাইপ ফাউণ্ডারির নাম ছিল ইষ্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডারি। সেটা এখনও আছে। পরে ভাল টাইপ তৈরির জন্য কালিকা টাইপ ফাউণ্ডারি সুনাম অর্জন করেছে। আগে এটা অবস্থিত ছিল বিবেকানন্দ রোড ও মদন মিত্র লেনের মোড়ে। এখন এরা স্থানান্তরিত হয়েছে ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশন ষ্ট্রীটে। এছাড়া আরও আছে যুগিপাড়া লেনে রক্ষিত টাইপ ফাউণ্ডারি। এদের আগে কারখানা ছিল শিবনারায়ণ দাসের লেনে। এখন শিবনারায়ণ দাসের লেনে একটা নতুন টাইপ ফাউণ্ডারি হয়েছে, নাম হিন্দ

টাইপ ফাউণ্ডারি। এ-ছাড়া আছে এম্. টাইপ ফাউণ্ডারি, কে. পি. বোসের ক্যালকাটা টাইপ ফাউণ্ডারি, আশুতোষ দেব-প্রতিষ্ঠিত বরদা টাইপ ফাউণ্ডারি ইত্যাদি। শ্রীসরস্বতী প্রেসও টাইপ তৈরি করে। এখন সব জায়গায় আর টাইপ হাতে তৈরি করা হয় না, কলেও তৈরি করা হয়। কলে টাইপ তৈরি অবশ্য বিদেশে অনেক আগেই প্রবর্তিত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কল হচ্ছে উইক্স্ রোটারি টাইপ কাস্টিং মেশিন ও 'সুপার কাস্টার'। কলকাতার আট-দশটি টাইপ ফাউণ্ডারি 'সুপার কাষ্টার' মেসিন ব্যবহার করে। বর্তমানে সুদক্ষ শিল্পী ও ছেনিকাটা-কর্মকারের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। শেষ ছেনিকাটা শিল্পী ছিলেন শর্বরীভূষণ কর্মকার। ইনি পঞ্চাননেরই পরিজন হবেন। মদন মিত্র লেনে একশ বছরের পুরানো রুদ্র টাইপ ফাউণ্ডারি নামে যে টাইপ ফাউণ্ডারি আছে, শর্বরীভূষণ তাদের টাইপের ছেনি কাটতেন। ফাউণ্ডারির সূচনায় তাদের হরফের ছেনি কেটেছিলেন অক্ষয় কর্মকার। এখন কলকাতায় প্রায় ৪০টা টাইপ ফাউণ্ডারি আছে। তাদের ব্যবসায়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বিনিযুক্ত। ২০ জন টাইপ ফাউণ্ডারকে নিয়ে ইণ্ডোসুইস ট্রেডিং কোম্পানির যতীন গুহ মহাশয় বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ডারস্ এসোশিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এক সময় ইণ্ডোসুইস ট্রেডিং কোম্পানি কলকাতার নানা ছাপাখানায় মুদ্রণের নানারকম সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্র থেকে আরম্ভ করে রোটারি মেশিন পর্যন্ত সরবরাহ করত।

আট

এতক্ষণ আমরা ফাউণ্ডারিতে তৈরি নড়নশীল বিচ্ছিন্ন হরফের (movable type) কথাই বলছিলাম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত ইওরোপ ও অন্যান্য দেশে এই পদ্ধতিতেই হরফ তৈরি করা হত (অবশ্য এখনও তা হয়)। তবে হরফ তৈরির ইতিহাসের গোড়ার দিকে সকলকেই নির্ভর করতে হত ওলন্দাজ টাইপ ফাউণ্ডারদের ওপর। তারাই বিশ্বের সর্বত্র টাইপ সরবরাহ করত। ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডের মুদ্রাকররা হরফের জন্য ওলন্দাজদের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে অকস্ফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসও এদের কাছ থেকেই হরফ কিনেছিলেন। তারপর

উইলিয়াম ক্যাসলন নামে এক ব্যক্তি ওলন্দাজদের হরফের ছাঁদের অনুকরণে বিলাতে প্রথম হরফ ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপন করে। তবে হরফের উৎকর্ষ ও দাম সস্তার জন্য ওলন্দাজরা এখনও প্রসিদ্ধ। দু-একজন প্রসিদ্ধ বিলাতি প্রকাশক এখনও তাদের বই হল্যাণ্ড থেকে ছাপিয়ে নেন। কেননা, অন্যান্য দেশের তুলনায় হল্যাণ্ডে মুদ্রণের দাম সস্তা।

কিন্তু মুদ্রণশিল্প এত দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছিল যে ছাপার কাজে সময় বাঁচাবার জন্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নানারকম মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হতে লাগল। সেসব কথা পরে বলব। হরফের ক্ষেত্রে কি হল, সে কথাই এখানে বলছি। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মরগানথেলার নামে এক ব্যক্তি এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার সাহায্যে মুদ্রণের জন্য আর হাতে হরফ সাজাবার প্রয়োজন হল না। টাইপরাইটার যন্ত্রের সামনে যেমন চাবি সাজানো (keyboard) থাকে, যা টিপলে কাগজের ওপর ছাপা হয়, তেমনি এই যন্ত্রের সামনে সজ্জিত ভিন্ন ভিন্ন হরফের চাবিগুলি টিপলেই একটা গোটা লাইন অক্ষর রচিত ও ঢালাই হয়ে ওই যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে। একে লাইনো-টাইপ বলা হয়। এই যন্ত্রের পিছন দিকে এক কক্ষে (magazine) শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন হরফের ম্যাট্রিকসগুলো সংরক্ষিত থাকে। ম্যাট্রিকসগুলোর পেটে হরফের ছাঁচ ক্ষোদিত থাকে। সামনের কী-বোর্ডে (keyboard) এক একটা অক্ষর টেপা মাত্রই সেই সেই বিশেষ হরফের ম্যাট্রিকস্ নিজ নিজ কক্ষ থেকে একটা গলির (channel) ভেতর দিয়ে সামনে এসে হাজির হয়। যন্ত্রের যে অংশের ওপর এসে হাজির হয়, তাকে 'লাইনার' বলা হয়। 'লাইনার' বিভিন্ন মাপের (measure) হয়। যেরূপ মাপের (measure) পঙ্‌ক্তি রচিত হবে, সেরূপ মাপের 'লাইনার' এই যন্ত্রে লাগিয়ে নেওয়া হয়। এরূপভাবে এক লাইন পরিমাণ ম্যাট্রিকস্ সামনে পাশাপাশি এসে হাজির হলেই যন্ত্রচালক (operator) যন্ত্রের এক পাশে অবস্থিত একটা হাতলের ওপর চাপ দেয়। হাতলে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই সজ্জিত ম্যাট্রিকস্‌গুলো ওই যন্ত্রের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট ঢালাই কলের দিকে সরে যায়। সেখানে গলন্ত সীসার ওপর ম্যাট্রিকসগুলো একটা গোটা লাইন মুদ্রিত করে দেয়। তারপর এই লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে ছাপার কাজে লাগানো হয়। ছাপা হয়ে গেলে, লাইনগুলো গালিয়ে ফেলে, আবার

ঢালাইয়ের জন্য ওই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। এই কলে ছাপার কাজে 'জাস্টিফিকেসন' ও 'ডিষ্ট্রিবিউশন'-এর কোন হাঙ্গাম নেই। 'ইন্টারটাইপ' নামে আর এক রকম যন্ত্র আছে, সেটা লাইনোটাইপেরই রূপান্তর। লাইনো টাইপের মত এতেও সমগ্রভাবে এক লাইন অক্ষর ঢালাই হয়।

'লাইনোটাইপ' হচ্ছে এক লাইনের যন্ত্র। তার মানে একই যন্ত্রের মধ্যে অক্ষর-পঙ্‌ক্তি সাজানো ও ঢালাই হয়। 'মনোটাইপ' কিন্তু তা নয়। এটা দুটো যন্ত্রের সমষ্টি। একটা যন্ত্রে টাইপরাইটার-এর ন্যায় চাবির ডালা (keyboard) আছে। ওই ডালার চাবি টিপলে 'রোল' করা কাগজের ওপর কতকগুলো ফুটা হয়। ওই ফুটাগুলো হচ্ছে অক্ষর অনুযায়ী বিভিন্ন। 'মনোটাইপ'-এর অপর ইউনিট হচ্ছে ঢালাই-কল। ফুটা করা কাগজ ওই কলে লাগিয়ে দিলে, অক্ষর ঢালাই হয়। তবে 'লাইনোটাইপ'-এর মত একটা সমগ্র পঙ্‌ক্তি ঢালাই হয় না। অক্ষরগুলো পৃথক পৃথক ভাবে ঢালাই হয়। তবে এই যন্ত্রেও স্বয়ংক্রিয় 'জাষ্টি ফিকেশন'-এর ব্যবস্থা আছে। তার ফলে অক্ষরগুলো সাজাবার সময়, আর 'জাষ্টিফিকেশন'-এর দরকার হয় না। 'লাইনোটাইপ' ও 'মনোটাইপ'-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে লাইনোটাইপ-এ রচিত পঙ্‌ক্তির মধ্যে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ থাকলে, সমগ্র পঙ্‌ক্তিটাকেই বাতিল করে দিয়ে, আবার নূতন করে একটা পঙ্‌ক্তি রচনা ও ঢালাই করতে হয়। 'মনোটাইপ'-এ তা হয় না। মাত্র ভুল হরফটি তুলে নিয়ে, তার জায়গায় শুদ্ধ হরফ বসিয়ে দিলেই হয়।

খবরের কাগজের পক্ষে 'লাইনোটাইপ' ও 'মনোটাইপ' বিশেষ উপযোগী। অধিকাংশ খবরের কাগজই 'লাইনোটাইপ' বা 'ইনটারটাইপ' যন্ত্র ব্যবহার করে। তবে লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকা গোড়া থেকেই 'মনোটাইপ' যন্ত্র ব্যবহার করে আসছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোধূলি ও উষা লগ্ন থেকে এদেশে 'লাইনোটাইপ' যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে বহু ছাপাখানায় 'মনোটাইপ' যন্ত্রও আছে।

কিন্তু তারপর গোটা চার দশক কেটে যায় বাংলা ভাষায় 'লাইনোটাইপ' প্রবর্তনের। তার আগেই অবশ্য লাইনোটাইপ কোম্পানি শ্রীহরি গোভিলের সাহায্যে হিন্দী ও গুজরাটি ভাষায় লাইনোটাইপ তৈরি করেছিল। বাংলা ভাষায় লাইনোটাইপ প্রবর্তিত হয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র

২

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টা ও সাহায্যে। এ কাজে সুরেশ-বাবু অবশ্য অনেকেরই সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁদের অন্যতম হচ্ছে রাজশেখর বসু ও যোগেশচন্দ্র রায়। আর মূল অক্ষরগুলির প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের সহায়তায় এস. কে. ভট্টাচার্য। এর অল্পদিন পরেই বাংলাভাষায় 'মনোটাইপ'-ও প্রবর্তিত হয়। গোড়াতে এঁদের শিল্পী কে ছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁরা কিছু নতুন ছাঁদের হরফ তৈরি করেছিলেন। তার শিল্পী ছিলেন সুহৃদ চক্রবর্তী। তিনি কলকাতার হরফ তৈরির কারখানা মহলে বিশেষভাবে সুপরিচিত।

বাংলায় 'লাইনোটাইপ' প্রবর্তনের একটা বিশেষ প্রভাব পড়েছে, হাতে সাজানো টাইপের ওপর। আগে একটা ফণ্টে (fount) হাতে সাজানো টাইপের সংখ্যা ছিল পাঁচশোর অনেক বেশি। এখন এর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে চারশোর অনেক কম। এর কারণ হচ্ছে, দশমিক মুদ্রা ও ওজন প্রথা চালু হবার ফলে আগেকার অনেক চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়তঃ মনোটাইপে মাত্র ৩৫১টি ও লাইনোটাইপে ৩৬০টি অক্ষর ব্যবহার করা হয়। এদেরই অনেকে অনুকরণ করছেন।

প্রায়ই অনুযোগ করা হয় যে বাংলার টাইপ ফাউণ্ডাররা অত্যন্ত রক্ষণশীল, তাঁরা নূতন ছাঁদের কোন টাইপ তৈরি করছেন না। অনুযোগটা খুব সত্য নয়। এখন আমাদের টাইপ ফাউণ্ডাররা নতুন ছাঁদের টাইপও তৈরি করেছেন।

লাইনো ও মনোটাইপ ছাড়া, আর এক রকমের টাইপ তৈরির যন্ত্রও ছাপার কাজের সুবিধা করে দিয়েছে। তাকে 'লাডলো' (Ludlow) মেশিন বলা হয়। এই যন্ত্র খবরের কাগজের ছাপাখানাতেই বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা সংবাদপত্রে প্রতি খবরের মাথায় যে শিরোনামা থাকে তা ঢালাই হয়। তবে লাইনো বা মনোটাইপের মত এই যন্ত্রে হরফের ম্যাট্রিকস্‌গুলো যন্ত্রের ভেতরে থাকে না, আলাদাভাবে একটা আধার বা 'কেস'-এর (case) মধ্যে থাকে। এগুলিকে হাতে করে সাজাতে হয়; সাজানো হলে সেটা পঙ্‌ক্তি বা সংবদ্ধাকারে ঢালাই করা হয়।

তবে ছাপার জন্য হরফ বিন্যাসের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের শেষ অবদান হচ্ছে কমপুটারাইজড্ কমপোজিং ও ফটোটাইপসেটিং মেশিন। বাংলা ছাপার ব্যাপারে এ সব যন্ত্র অনতিকাল মধ্যে ব্যবহৃত হবে বলে মনে হয় না।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার

এক

মাত্র হরফ হলেই ছাপার কাজ সম্পন্ন হয় না। ছাপার জন্ত প্রয়োজন হয় মুদ্রাযন্ত্র। মুদ্রাযন্ত্র এদেশে প্রবর্তন করেছিল পোর্তুগীজরা। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তারা একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়া নগরে। বাঙলায় তারা মুদ্রাযন্ত্র এনেছিল কি না, তা আমাদের জানা নেই। পোর্তুগীজদের পরে এদেশে আসে ওলন্দাজ ও ইংরেজরা। ইওরোপে ছাপাখানার কাজে ওলন্দাজরা বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। আগেই বলেছি যে যদিও প্রথম ছাপা বই বিতর্কিতভাবে জারমানিতে মুদ্রিত হয়েছিল, তথাপি মুদ্রণ শিল্পে ও ছাপার উপকরণ প্রস্তুতে হল্যাণ্ডই ছিল সর্বপ্রধান। এখান থেকেই ছাপাখানার যন্ত্র, হরফ ও অন্যান্স উপকরণ ইংলণ্ডে ও ইওরোপের বিভিন্নদেশে গিয়েছিল। সুতরাং ওলন্দাজরা যখন বাঙলায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তখন এখানে মুদ্রাযন্ত্র আনাও তাদের পক্ষে স্বাভাবিক কর্ম ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রমাণ সম্পূর্ণ নীরব।

১৫৫৬ থেকে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গোয়া প্রেস থেকে ৩৪ খানা বই ছাপা হয়েছিল। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তামিল হরফেও তাঁরা একখানা বই বের করেছিলেন।

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা পণ্ডিচেরী থেকে একটা ছাপাখানা অধিকার করে এনেছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকের অভাবে মাদ্রাজে অবস্থিত এই ছাপাখানা চালু করা সম্ভবপর হয় নি।

বাঙলায় মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন সম্বন্ধে যা কিছু প্রমাণ আছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদেই এখানে ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। কেন না, হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপাবার জন্ত যখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজন হল, তখন হুগলিতে এন্‌ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানায় সে কাজটা সমাধা হয়েছিল। তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে হ্যালহেডের ব্যাকরণ ছাপবার আগেই হুগলিতে ছাপাখানার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হুগলির পরই কলকাতা। তবে কলকাতা আগেও হতে পারে। কেননা ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বোলট্স্ কলকাতা

থেকে একখানা খবরের কাগজ বের করতে চেয়েছিলেন। হাতের কাছে ছাপাখানা না থাকলে, তিনি এরূপ সঙ্কল্প করতেন না। তবে কলকাতায় হিকির ছাপাখানার কথাই আমরা প্রথম শুনি।

কলকাতার এই ছাপাখানা থেকেই জেমস্ অগষ্টস্ হিকি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বের করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'বেঙ্গল গেজেট'। ওই বছরেই নভেম্বর মাসে বি. মেসিঙ্ক ও পিটার রীডের যৌথ উদ্যোগে বের হয়েছিল 'ইণ্ডিয়া গেজেট'। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিকি তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' বের করলেও ছাপাখানাটা হিকি স্থাপন করেছিল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, তার মানে যে বছর হালহেড ছাপিয়েছিলেন হুগলির এনড্রুজ সাহেবের ছাপাখানায় তাঁর ব্যাকরণ। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিকি পাঠকদের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন 'দি ফার্স্ট অ্যাণ্ড লেট প্রিণ্টার টু দি অনারেবল কোম্পানি' বলে। কোম্পানির প্রাক্তন মুদ্রাকর হিসাবে পরিচয় দেবার কারণ হচ্ছে, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিনসের পরিচালনাধীনে কোম্পানির নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। এর পরেই কলকাতায় আরও কয়েকটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রনিকল প্রেস, সেখান থেকে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এ. আপজন ছাপিয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি'। ক্রনিকল প্রেস অবস্থিত ছিল ৮নং লালবাজারে। আরও একটা ছাপাখানার নাম আমরা জানতে পারি। সেটা হচ্ছে ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানা। সেখান থেকে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে বের হয়েছিল এইচ. পি. ফরষ্টার সাহেবের 'ভোকাবুলারি'। আরও যেসব ছাপাখানার নাম আমরা জানতে পারি তা হচ্ছে মিলিটারি অরফ্যান প্রেস, গভর্নমেণ্ট গেজেট প্রেস ও স্যামুয়েল স্মিথ অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রেস। এই সময় স্থাপিত হয় শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস। এটা স্থাপিত হয়েছিল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। এর পিছনে ছিলেন তিন মহারথী—জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬০-১৮৩৭), উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ও উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২১)। এদের মধ্যে ওয়ার্ড ও কেরীই ছিলেন মুদ্রণশিল্পে অভিজ্ঞ। ওয়ার্ড এদেশে আসবার আগেই বিলাতে এক মুদ্রাকরের কার্যালয়ে শিক্ষানবিশি করেছিলেন। কেরী মালদহের মদনবাটীতে উডনি সাহেবের নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের কাজ করতেন। সেখানে উডনি তাঁকে

একটা কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে দিয়েছিলেন। সেই মুদ্রাযন্ত্রের কাজেই কেরীর মুদ্রণবিদ্যায় হাতেখড়ি। জানি না এই ছাপাখানাতেই ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাডউইনের বিখ্যাত ইংরেজি-ফারসি অভিধান ছাপা হয়েছিল কি না। যদি না হয়ে থাকে, তা হলে বলতে হবে যে মালদহে আরও ছাপাখানা ছিল।

মদনবাটীর কুঠি বন্ধ হয়ে গেলে কেরী উডনির কাছ থেকে খিদিরপুর গ্রাম কিনে নিয়ে সেখানে তাঁর সহকারী জন ফাউনটেনের সঙ্গে বসবাস করেন। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের শেষের দিকের কথা। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, গ্রাণ্ট প্রভৃতি যখন শ্রীরামপুরে আসেন, তখন কেরী তাঁর কষ্টার্জিত খিদিরপুরের সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যুগ্ম চেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপন করেন। শ্রীরামপুর মিশনই এদেশে ব্যাপকভাবে বাংলা সাহিত্য প্রচারে ব্রতী হন। এঁরা না কি কাজ আরম্ভ করেছিলেন উডনির সেই কাঠের প্রেসটা নিয়ে।

দুই

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই শুরু হয় ছাপাখানা স্থাপনের মরশুম। শতাব্দীর প্রারম্ভেই ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের পর উইলিয়াম হাণ্টার স্থাপন করেন তাঁর হিন্দুস্থানী প্রেস। এর পরের ১৫।১৬ বছরের মধ্যে স্থাপিত হয় খিদিরপুরের বাবুরামের প্রেস, চোরবাগানে হরচন্দ্র রায়ের বাঙালী প্রেস, পটলডাঙ্গায় লল্লুরামের সংস্কৃত প্রেস ও শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস।

এ সময় ছাপাখানার লাইনে বিশেষ উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তাঁর বাড়ি ছিল বহড়া গ্রামে। শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে কম্পোজিটার হিসাবে গঙ্গাকিশোর ছাপাখানার কাজ শেখেন। তারপর তিনি কলকাতায় এসে পুস্তক প্রকাশ ও ব্যবসায়ে হাত দেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতার ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানা থেকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছাপান। এখানিই প্রথম বাংলা সচিত্র বই। পুস্তকের ব্যবসায়ে লাভবান হয়ে, গঙ্গাকিশোর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এর নাম ছিল বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস। তারপর হরচন্দ্র রায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়ে তিনি 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে

একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। তারপর হরচন্দ্রের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মুদ্রাযন্ত্র নিজগ্রাম বহড়ায় নিয়ে যান।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যেই ছাপাখানার যে অসাধারণ প্রসার ঘটেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে নানা ভাষায় বই ছাপা ছাড়া বহু সংবাদপত্রও বেরুতে আরম্ভ হয়েছিল। তার মধ্যে ইংরেজিতে ছিল—বেঙ্গল হরকরা ও ক্রনিকল, জন বুল, কলিকাতা গেজেট, গভর্নমেণ্ট গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল ক্রনিকল, বেঙ্গল হেরাল্ড, লিটেরারি গেজেট, ওরিয়েণ্টাল অবজার্ভার, কলিকাতা একসচেঞ্জ প্রাইস কারেণ্ট, ডোমেষ্টিক রিটেল প্রাইস কারেণ্ট হিন্দি উদন্ত মার্তণ্ড, ফারসি জামজী জাহান্নুমা, বাংলা সমাচারদর্পণ, বঙ্গদূত, সমাচারচন্দ্রিকা, সম্বাদ কৌমুদী, সম্বাদ তিমিরনাশক ইত্যাদি।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অকটোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ—"দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কন কার্যের অপূর্বরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতা নগরে ভূরি ভূরি ঐ যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে। তদধ্যক্ষরা এইক্ষণে প্রতিযোগিতারূপে এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমরূপ অথবা অল্পমূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন।" তার দুবছর পরেকার এক সংবাদে দেখি—"ছাপাখানার পরিচালকরা দুহাতে টাকা রোজগার করছেন, তাঁদের কারও কারও আয় কাউনসিলের মেম্বারদের আয়ের সমান।" (ফ্রেণ্ড অভ ইণ্ডিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫)। মোটকথা, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ছাপাখানার সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লঙ সাহেব বাংলা বই ও পত্রিকা ছাপার জন্য ৪৬টি ছাপাখানার উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২২৯টি। তাদের মধ্যে যেগুলোর নাম আমাদের জানা আছে (উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্থাপিত) সেগুলি হচ্ছে—স্ট্যানহোপ প্রেস, তিমিরনাশক যন্ত্র, চোরবাগান সংবাদপ্রভাকর প্রেস, রামমোহন রায়ের ইউনিটারিয়ান প্রেস, কানাইলাল ঠাকুরের সম্বাদ সুধাকর মুদ্রাযন্ত্র, নেবুতলার উপেন্দ্রলাল যন্ত্র, মিরজাপুরের চার্চমিশন মুদ্রাযন্ত্র, চোরবাগান স্কুলবুক যন্ত্র, আশুতোষ দেবের ভাস্কর যন্ত্র, বড়বাজার পঞ্চাননতলার সুধানিধি প্রেস, কলকাতার ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস (এটা ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছিল), নিউ বেঙ্গল প্রেস, অ্যালবার্ট প্রেস, বীণা প্রেস, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ভাস্কর যন্ত্রালয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্থাপিত সংস্কৃত যন্ত্র, অনুবাদ প্রেস, বাঙ্গালা যন্ত্র, বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা প্রেস, বেঙ্গল সুপিরিয়র প্রেস, বিশপস্ কলেজ প্রেস, ভুবনমোহন প্রেস, বিশ্বপ্রকাশ প্রেস, চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রেস, চন্দ্রিকা প্রেস, কোনস প্রেস, হরিহর প্রেস, হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রেস, জ্ঞানোদয় প্রেস, জ্ঞানরত্নাকর প্রেস, কবিতারত্নাকর প্রেস, কাদেরিয়া প্রেস, নিউ প্রেস, রিফরমার মুদ্রাযন্ত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের চিৎপুরস্থ পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র, জগজ্জ্যোতি গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত প্রেস, ভিকটোরিয়া প্রেস, লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, নিউ প্রেস, নিস্তারিণী প্রেস, নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা প্রেস, পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস, রহমানী প্রেস, রায় প্রেস, রয়াল ফিনিক্স প্রেস, রোজারিও প্রেস, সর্বার্থপ্রকাশিকা প্রেস, সত্যার্ণব প্রেস, শাস্ত্রপ্রকাশ প্রেস, সুচারু প্রেস, সুধাবর্ষণ প্রেস, সুধানিধি প্রেস, সুধার্ণব প্রেস, তত্ত্ববোধিনী প্রেস, বিদ্যারত্ন যন্ত্র; বঙ্গদর্শন প্রেস, মথুরানাথ মিত্রের প্রেস, সুধাসিন্ধু প্রেস, কমলালয় প্রেস, রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেস, মিরজাপুর দপ্তরিপাড়ার কল্পদ্রুম প্রেস, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রেস, হরিহর যন্ত্র, বঙ্গবাসী প্রেস, বি. পি. এম. প্রেস, বসুমতী প্রেস ইত্যাদি। মফস্বলেও অনেক ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল বহড়ায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের প্রেস, শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় প্রেস, শ্রীরামপুর তমোহর প্রেস, শ্রীরামপুর বিদ্যাদায়িনী প্রেস, শ্রীরামপুর ফ্রেণ্ড অভ ইণ্ডিয়া প্রেস, হুগলি বুধোদয় যন্ত্র, ঢাকা বিজ্ঞাপনী প্রেস, বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় ইত্যাদি। ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে মোট ১,০৯৪টি ছাপাখানা ছিল; তার মধ্যে বাংলায় সবচেয়ে বেশি ২২০টি। বই ছাপা হয়েছিল ৭,৯৯৯ খানা; তার মধ্যে বাংলায় ২,৪১৪ খানা।

এইভাবে ছাপাখানার ইতিহাসে আমরা বিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছাই। বিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়েছে ছোট বড় হাজার হাজার ছাপাখানা। ছাপাখানার এই মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা নিজেদের এমন ভাবে হারিয়ে ফেলি যে তাদের তালিকা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে ছাপার কাজের জন্য যে সকল ছাপাখানা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল বা করেছে, তাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে তাদের মধ্যে অনেকেই আজ আর জীবিত নেই।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় কুন্তলীন প্রেস। ভাল ছাপার জন্য এর নাম ছিল। উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য আর যারা গৌরব অর্জন করেছিল, তাদের অন্যতম হচ্ছে ইণ্ডিয়ান প্রেস (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চিন্তামণি ঘোষ কর্তৃক এলাহাবাদে স্থাপিত)

মহিলা প্রেস, নরেন মুখুজ্যের আর্ট প্রেস, দুর্গা পিতুরি লেনের মডার্ণ আর্ট প্রেস, গোঁসাইন কোম্পানির প্রেস, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, শ্রীসরস্বতী প্রেস, ইষ্ট এণ্ড প্রিণ্টার্স ইত্যাদি। এদের মধ্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস, ইণ্ডিয়ান প্রেস (কলকাতায় অবস্থিত), ও ইষ্ট এণ্ড প্রিণ্টার্স এখনো পুরানো নাম নিয়ে জীবিত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কিছুকাল যাবৎ বন্ধ আছে; তার শূন্যস্থান এখন পূরণ করেছে আনন্দ প্রিণ্টার্স। গোঁসাইন কোম্পানির ছাপাখানা এখন বিভক্ত হয়ে গেছে। নতুন এক শাখার নাম লালচাঁদ রায়। ভাল ছাপার জন্য আর যারা প্রসিদ্ধ তাদের মধ্যে আছে ক্রমোটাইপ কোম্পানি, নাভানা প্রিণ্টিং, জেনারেল প্রিণ্টারস্ ও নবজীবন প্রেস।

গত দুশো বছরের ছাপাখানার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এদেশে ছাপাখানার আয়ুষ্কাল স্বল্প। এমন কি শতায়ুর ওপর হয়েও ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস সম্প্রতি (১৯৭০) উঠে গেছে। গত শতাব্দীর যে সব ছাপাখানার নাম আগে করেছি তাদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান আছে গুপ্তপ্রেস (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত), আশুতোষ দেবের ছাপাখানা ও ইণ্ডিয়ান প্রেস। এমন কি সাহেবদের পরিচালিত অনেক ছাপাখানাও মৃত বা হস্তান্তরিত। যেমন থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির ছাপাখানা, ডবলিউ. নিউম্যান অ্যাণ্ড কোম্পানির ছাপাখানা, এডিনবরা প্রেস, ক্ল্যারেনডন প্রেস ইত্যাদি। ছাপাখানার চলনকাল এত অল্প কেন, তা' গবেষণার বিষয়। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্থাপিত হয়ে, ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে একটা ছাপাখানা, সেটা হচ্ছে শ্যামবাজারের টেম্পল প্রেস। এরা মাত্র বই ছাপার কাজ করে, জব প্রিন্‌টিং করে না। আর সাহেবদের ছাপাখানার মধ্যে দুটো বড় ছাপাখানা—গ্যাঞ্জেস প্রিন্‌টিং ও হুগলি প্রিনটিং এখন খানিকটা ভারতীয়করণ হয়ে গেছে। আর mass printing-এর জন্য প্রসিদ্ধ দুটো ছাপাখানার মধ্যে করিম বকস্ অ্যাণ্ড কোম্পানি উঠে গেছে (তার পরিবর্তে হয়েছে অ্যানটুল অ্যাণ্ড কোং)। লালচাঁদ অ্যাণ্ড সনস্ জীবিত আছে। এরা মূলতঃ সরকারি ঠিকাদারি কাজ করে।

এখন শহরের অনেকগুলি ছাপাখানাতেই বাংলা লাইনোটাইপ বা মনোটাইপ যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে এখন ১০০ পাতার একখানা বই সাত আট দিনের মধ্যে ছাপিয়ে বের করা সম্ভবপর হয়েছে। হাতে-সাজানো টাইপে ছাপাতে গেলে এর সময় লাগে দু মাস। তবে লাইনোটাইপে বা মনোটাইপে

ছাপার খরচ অনেক বেশি বলে খুব কম পুস্তক প্রকাশক এদের সাহায্য গ্রহণ করেন।

তিন

এতক্ষণ ছাপাখানার ইতিহাস সম্বন্ধেই বলা হচ্ছিল। এবার ছাপাখানার যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। একেবারে গোড়ায় ছিল কাঠের মুদ্রাযন্ত্র। তারপর তারই আদর্শে তৈরি হল লোহার প্রেস। তারপর ক্রমিক গতিতে এল প্ল্যাটেন প্রেস, সিলিণ্ডার প্রেস ও রোটারি প্রেস। এই তিন রকম প্রেসের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে প্ল্যাটেন প্রেস। প্ল্যাটেন প্রেসের সংখ্যাই হচ্ছে জগতে সবচেয়ে বেশি এবং ছোটখাটো মুদ্রাকররা তাদের ছাপার কাজ প্ল্যাটেন প্রেসেই সমাধা করে। এ ধরনের মুদ্রাযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সজ্জিত হরফগুলিকে একটা লোহার ফ্রেমে শক্ত করে এঁটে মুদ্রাযন্ত্রের পীঠিকার ওপর স্থাপন করে আবদ্ধ করা হয়। তারপর তাতে জিলেটিনের তৈরি রোলার-এর সাহায্যে কালি লাগানো হয়। তারপর তার পিছনে অবস্থিত প্লেটের ওপর সাদা কাগজ সমতলভাবে পিনের মধ্যে আবদ্ধ করে, সেখানাকে সামনের দিকে এনে পীঠিকার ওপর ফেলে যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দেওয়া হয়। সিলিণ্ডার প্রেসে কিন্তু তা করা হয় না। সিলিণ্ডার প্রেসেও সাজানো টাইপগুলোকে পীঠিকার ওপরই আবদ্ধ করা হয়, কিন্তু কাগজখানাকে একটা রোলার-এর সাহায্যে পীঠিকার ওপর দিয়ে চালিয়ে চাপ দেওয়া হয়। রোটারি প্রেসে কাগজ ছাপা হয় অন্যরকমভাবে। সজ্জিত হরফগুলো এক রকম কাগজ-এর (papier mache) ওপর চাপ দিয়ে একটা ছাঁচ তৈরি করে নেওয়া হয়। তারপর সেই ছাঁচ থেকে অর্ধচন্দ্রাকার একটা ধাতব ছাঁচ তৈরি করা হয়। সেই অর্ধচন্দ্রাকার ধাতব ছাঁচটা মুদ্রাযন্ত্রে সংযুক্ত করা হয়। কাগজ বেলনাকার রীলে গুটানো থাকে। মুদ্রাযন্ত্রে সংযুক্ত অর্ধচন্দ্রাকার ছাঁচখানা বেলনাকার কাগজের রীলটার সংস্পর্শে এলে মুদ্রণ কাজটা সম্পন্ন হয়। মোট কথা, রোটারি প্রেসে কখনও সরাসরি সাজানো হরফ বা সমতল ধাতব পাত থেকে ছাপার কাজ করা যায় না। রোটারি প্রেস সাধারণতঃ খবরের কাগজের অফিসেই ব্যবহৃত হয়। এগুলো সবই শক্তি-চালিত।

সংবাদপত্র ছাপবার জন্য কলকাতায় রোটারি মেশিনের প্রবর্তন করে 'ষ্টেটস্-

ম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা। পরে 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' ও 'বসুমতী'ও রোটারি মেশিন প্রবর্তন করে। বহুবৎসর যাবৎ 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠার (তখনকার দিনে প্রথম পৃষ্ঠায় কোন সংবাদ ছাপা হত না, মাত্র বিজ্ঞাপন ছাপা হত) শিরোদেশে গর্বের সঙ্গে ছাপতো 'এই কাগজ এহেন রোটারি মেশিনে মুদ্রিত যাতে ঘণ্টায় ২০,০০০ কপি ছাপা হয়।' ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সহিত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা মিলিত হয়ে যায়। তখন 'ইংলিশম্যান'-এর রোটারি মেশিনটা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কিনে নেয়। পরবর্তী বিশ বছর যাবৎ ওই মেশিনটাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাঠক সমাজের সেবা করে এসেছে। তারপর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নতুন রোটারি মেশিন স্থাপন করে। ওদিকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের ছাপাখানাটা কিনে নিয়ে স্থাপিত করেন 'ফরওয়ার্ড পত্রিকা।

এদিকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' জারমানিতে তৈরি এমন এক রোটারি মেশিন স্থাপন করে, যাতে এক সঙ্গে ৪৮ পাতা ছাপা হয়। (তখনকার দিনে দৈনিক সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা হত ২৮ থেকে ৩২ পৃষ্ঠা ও রবিবারে ৪৮ থেকে ৬৪ পৃষ্ঠা)। এই প্রেসেই 'যুগান্তর' পত্রিকা ছাপা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকাও এক নতুন রোটারি মেশিন বসায়, যাতে দুই ইউনিটে ৬৪ পাতা ছাপা হতে পারে। এখন কলকাতার অন্যান্য সকল দৈনিক পত্রিকাই রোটারি মেশিন ব্যবহার করে।

চার

এইবার কতগুলো অদ্ভুত মুদ্রাযন্ত্রের কথা বলব। নারিকেলডাঙ্গার গর্ডন কোম্পানরি ছাপাখানায় এমন একটা মেশিন ছিল যাতে অনন্ত ফিতার আকারে সিনেমার টিকিট ছাপা হত ও সঙ্গে সঙ্গে তার নম্বর ও দুই টিকিটের মাঝখানে 'পারফোরেশন' হত। সোয়ার সারকুলার রোডে (বর্তমানে আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু রোড) অবস্থিত লালচাঁদ অ্যাণ্ড সনস্‌-এর ছাপাখানাতেও এক অদ্ভুত মেশিন আছে। এ মেশিনের এক দিক দিয়ে কাগজ প্রবেশ করে, আর অপর দিক দিয়ে একখানা গোটা বই বাঁধানো ও মলাট সমেত বেরিয়ে আসে। এটা

ওঁরা পোষ্ট অফিসে ব্যবহৃত মনি অর্ডার, রেজিষ্ট্রেশন প্রভৃতির রসিদ বই ও ব্যাঙ্কের চেক বই ছাপার জন্ত ব্যবহার করেন। এ মেশিনটার এক দিকে দুরকম কাগজের রীল লাগানো থাকে। এক রকম কাগজে রসিদ বা চেক ছাপা হয় ও দ্বিতীয় রকম কাগজে রসিদ বা চেক বইয়ের মলাট ছাপা হয়। মেশিনটা যখন চালিয়ে দেওয়া হয়, তখন রসিদগুলো ছাপা হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তার নাম্বারিং ও পারফোরেশন হয়। একটা পাতায় যে ক'খানা রসিদ থাকে, তা ছাপা হওয়া মাত্র, পাতাটা কেটে যায় ও পার্শ্বস্থ একটা তাকে জমা হতে থাকে। একশত পাতা ছাপা হবার পর, এক দিকে ওই একশত পাতার বই তার দিয়ে সেলাই হয় ও তার পিছন দিকে আটা লাগানো হয়। ইত্যবসরে মলাট ছাপা ও নাম্বারিং হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়, ও আটা লাগানো বই-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মলাটযুক্ত সম্পূর্ণ বইয়ের আকার ধারণ করে। তারপর ওই মেশিনেই বইখানার তিন দিক ছাঁটাই হয়ে যায়। মেশিনটা সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় ও শক্তি-চালিত। বিদেশে পেপার-ব্যাক বইগুলো এই রকম মেশিনেই ছাপা হয়। আরও অনেক অদ্ভুত রকমের মুদ্রাযন্ত্র কলকাতার কয়েকটি ছাপাখানায় আছে, যা দেখবার মত জিনিস। কিন্তু সেগুলো আমাদের প্রসঙ্গের বাইরে বলে, তার বর্ণনা দেওয়া হল না।

পাঁচ

লিথোগ্রাফি প্রথায় ছাপার কাজে অক্ষর ব্যবহারের বালাই নেই। ছাপবার বিষয়বস্তুটা প্রথম একরকম কালিদ্বারা কাগজের ওপর লেখা বা আঁকা হয়। তারপর ওই কাগজখানাকে এক রকম কোমল পাথরের ওপর চাপা দিলে, ওই কাগজের ওপর লেখা বা আঁকা জিনিসটার ছাপ পাথরের ওপর পড়ে। কিছু কাল পরে পাথরের ওপর ওই লেখাটি কিঞ্চিৎ স্ফীত হয়ে ওঠে। তখন অন্ত কালি দিয়ে ছাপলে, ওর প্রতিলিপি কাগজের ওপর ওঠে। এই ভাবে এক লক্ষ কাগজ সমানভাবে ছাপা হয়।

ভারতে লিথোগ্রাফির প্রচলন সম্বন্ধে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা জর্নাল'-এ লিখিত হয়েছিল যে কলকাতায় মিষ্টার বেলনস্ (Belnos) ও মিষ্টার ছ সাবিগনাক (de Savignac) নামক দুজন ফরাসি শিল্পী কর্তৃক

লিথোগ্রাফিক ছাপার কাজ বিলাতের মত সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এক সংবাদে আমরা অবগত হই যে শুঁড়ার লিথোগ্রাফিক প্রেসে নানাবিধ গ্রন্থ ও নানাপ্রকার ছবি বিশেষত হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ছাপা হচ্ছে। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে শুঁড়ার লিথোগ্রাফিক প্রেস ছাড়া, আরও কয়েকটি লিথোগ্রাফিক প্রেস ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় গভর্নমেন্ট লিথোগ্রাফিক প্রেস, এশিয়াটিক লিথোগ্রাফিক প্রেস, ধর্মতলার টি. বি. টাসিন কোম্পানি, লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের কমার্সিয়াল লিথোগ্রাফিক প্রেস, বলিনস লিথো, ওরিয়েণ্টাল লিথোগ্রাফিক, হারমনিক লিথো, এম. এন. নানহটিস ইত্যাদি। উর্দু অক্ষর নির্মাণের পূর্বে উর্দু ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি লিথোগ্রাফিক প্রণালীতেই ছাপা হত। এখনও হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' লিথোয় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতার বৌবাজারের অন্নদা বাগচী প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ষ্টুডিয়ো লিথোগ্রাফিক প্রণালীতে হিন্দু দেবদেবীর অনেক মূর্তি ছেপেছিলেন। ওদিকে এলাহাবাদে চিন্তামণি ঘোষ লিথোগ্রাফি মুদ্রণের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তার ফলেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী প্রমুখ অনেক শিল্পীর অঙ্কিত নানাবিধ বহুবর্ণ চিত্রাদির মুদ্রণ সম্ভব হয়েছিল।

লিথোগ্রাফিরই বংশধর হচ্ছে বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত অফসেট্ প্রিন্‌টিং। অফসেট প্রিন্‌টিং-এ পাথরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় রাবার। রাবারের ওপর প্রতিলিপিটা আলোকচিত্রের সাহায্যে ওঠানো হয়। আমার যতদূর মনে আছে এদেশে সর্বপ্রথম অফসেট্ প্রিনটিং-এ ছাপা বই হচ্ছে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির 'A Nation in Making'। এটা অকস্‌ফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস প্রকাশ করেছিল এবং ছেপেছিল ইণ্ডিয়ান প্রেস। এখন অনেক ছাপাখানাই অফসেট প্রণালীতে ছাপার কাজ করে। তাদের মধ্যে আছে সান্ লিথোগ্রাফিং কোম্পানি, শ্রীসরস্বতী প্রেস, আনন্দ প্রিণ্টারস্, ইণ্ডিয়ান প্রেস, স্পিড্-ও-লিথ অফসেট কোম্পানি ও অন্যান্য অনেকে।

ছয়

এদেশে মুদ্রাযন্ত্র তৈরি করবার প্রথম চেষ্টা করে শিকদার কোম্পানি। তারপর নানা রকম মুদ্রাযন্ত্র এদেশে আলামোহন দাশের ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোম্পানিও তৈরি শুরু করে। এখন সরকারি মহলে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস্ নানারকম মুদ্রাযন্ত্র তৈরি করছে।

ছাপার কাগজ ও কালি

এক

মাত্র অক্ষর ও মুদ্রাযন্ত্র হলেই ছাপার কাজ সম্পন্ন হয় না। চাই কাগজ ও কালি। হ্যালহেডের 'গ্রামার' এদেশের হাতে তৈরি কাগজেই ছাপা হয়েছিল। হাতে তৈরি কাগজ শিল্পের বয়স এদেশে হাজার বছরের ওপর। কাশ্মীর থেকে ওড়িশা পর্যন্ত এদেশের নানা জায়গায় কাগজ তৈরি হত। তবে বাঙলা দেশের কাগজ, বিশেষ করে বর্ধমান, শ্রীরামপুর ও ঢাকার কাগজই সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হত। দেশী কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান ছিল শন, তুলা ও তিসির তন্তু। এগুলিকে ঢেঁকিতে কুটে মণ্ড তৈরি করা হত। মণ্ড তৈরির সময় অনেক সময় চুন মেশানো হত। কাগজটা যাতে কীটদষ্ট না হয়, তার জন্য হলুদও মেশানো হত। সেরূপ কাগজের রঙ হলদে হত। আর তুলার মণ্ড দিয়ে যে কাগজ তৈরি হত, তাকে তুলাট কাগজ বলা হত।

দুই

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারিরা যখন এদেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে বই ছাপতে আরম্ভ করল, তখন তারা দেশজ সূত্র থেকেই কাগজ সংগ্রহ করত। কিন্তু ছাপার কাজ যখন বেড়ে গেল, তখন তারা পরনির্ভরশীল না থেকে ১৮০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে নিজেরাই কাগজ তৈরির একটা কল স্থাপন করল। এরাও উপাদানটা ঢেঁকিতে কুটতো। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটায় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তারা হল্যাণ্ড থেকে একটি পেশাই যন্ত্র নিয়ে আসে, এবং ষ্টীম ইঞ্জিন সাহায্যে কলটাকে শক্তি-চালিত করে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কলটা বন্ধ হয়ে যায়, এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বালিতে 'রয়্যাল পেপার মিল' স্থাপিত হয়, তখন তারা শ্রীরামপুর মিশনের কাছ থেকে কলটা কিনে নেয়। পরে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে টিটাগড় পেপার মিল যখন বালির ওই মিলের স্বত্ব কিনে নেয়, তখন তারা কলটাকে টিটাগড়ে নিয়ে যায়।

বালির রয়্যাল পেপার মিলের পর এদেশে আরও কাগজের কল স্থাপিত হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের বাদসাহ নগরে অপার ইণ্ডিয়া কুপার

পেপার মিল স্থাপিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে টিটাগড়ে টিটাগড় মিল স্থাপিত হয়। পরে এই মিলের অঙ্গ হিসাবে কাঁকিনাড়াতেও একটা মিল স্থাপিত হয়। তারপর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরল রাজ্যের পুনালুরে পুনালুর পেপার মিল নামে একটা মিল স্থাপিত হয়। ওরই পরের বছর রাণীগঞ্জে বেঙ্গল পেপার মিল স্থাপিত হয়। তারপর নতুন কাগজ কল স্থাপনের বিরতি ঘটে। কারণ বিলাতি কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমদানিকৃত বিলাতি কাগজসমূহ উৎকৃষ্ট মানের হত। এ ছাড়া, দামও সস্তা ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) যখন বিলাতি কাগজের আমদানি হ্রাস পেল, তখন এখানকার উদ্যোগকারীরা আবার কাগজ কলপ্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগনার নৈহাটির কাছে হাজিনগরে ইণ্ডিয়া পেপার পালপ কোম্পানি স্থাপিত হল। কিন্তু শীঘ্রই বিনিময় হারের হেরফেরের জন্য সস্তার বিলাতি কাগজে বাজার ছেয়ে গেল। বিপর্যস্ত হয়ে দেশীয় মিলসমূহ সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কাগজ শিল্প সম্পর্কে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সামান্য পরিবর্তনের সহিত এই নীতি বহাল ছিল। সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের পর এদেশে আরও কাগজকল স্থাপিত হতে লাগল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশার ব্রজ-রাজনগরে ওরিয়েন্ট পেপার মিল স্থাপিত হল। পরে এরা মধ্যপ্রদেশের আমলাইতেও একটা মিল স্থাপন করে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও তিনটা মিল স্থাপিত হল, মহীশূরের ভদ্রবাটীতে মহীশূর পেপার মিল স্থাপিত হল, উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে ষ্টার পেপার মিল স্থাপিত হল, ও আম্বালা ও সাহারানপুরের মধ্যে জগধরি রেল ষ্টেশনের কাছে শ্রীগোপাল পেপার মিল স্থাপিত হল। আরও দুটো মিল সৃষ্টি হল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। একটা অন্ধ্র প্রদেশের আদিলাবাদ জেলায় সিরপুর পেপার মিল ও আর একটা ওড়িশার কোরাপুট জেলায় ষ্ট্র প্রোডাকটস-এর মিল। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আওতায় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হল বল্লারপুর পেপার অ্যাণ্ড বোর্ডস কোম্পানি ও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেণীর নিকট চন্দ্রহাটিতে ত্রিবেণী টিস্যুস্। তারপর ভারত স্বাধীনতা লাভ করল, এবং কাগজকল সমূহের উন্নতির জন্য ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণভাবে বিলাতি কাগজ আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হল। এখন মাত্র প্রকৃত ব্যবহারকারীদের (actual consumers) কাগজ আমদানি করবার সীমিত লাইসেনস দেওয়া হয়। এর প্রতিফলে আবার

নতুন করে কাগজ কল প্রতিষ্ঠার হিড়িক এল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কানাড়ার দান্দেলী নামক স্থানে ওয়েষ্ট কোষ্ট পেপার মিল স্থাপিত হল। ওই বছরেই মধ্যপ্রদেশে ন্যাশনাল নিউজপ্রিনট অ্যাণ্ড পেপার মিল স্থাপিত হয়। এর দু'বছর পরে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও আসামে স্থাপিত হল অশোক পেপার মিল। পরের বছর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ায় স্থাপিত হল ইষ্ট-এণ্ড পেপার ইণ্ডাষ্ট্রিজ। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হল দক্ষিণ ভারতের সালেম জেলার পল্লীপালায়ামে শেশাসায়ী পেপার অ্যাণ্ড বোর্ড মিলস। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগোপাল পেপার মিল ও বল্লারপুর পেপার মিল সম্মিলিত হয়ে বল্লারপুর পেপার ইণ্ডাষ্ট্রিজ নাম ধারণ করল। এছাড়া ওই বছরই উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে কেমো পালপ্ টিস্যুস নামে একটা নতুন মিল স্থাপিত হল।

এ ছাড়াও দেশের নানা জায়গায় ছোটখাটো অনেক কাগজ কল আছে। সাম্প্রতিক কালে সরকারি মহলেও কাগজ কল স্থাপনের প্রয়াসে হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন নামে একটা সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সংস্থা ইণ্ডিয়ান পেপার পালপ্ কোম্পানির পরিচালন ভার গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া, আসাম ও ত্রিপুরায় দুটা মিল স্থাপনের আয়োজনও চলছে। দিয়াশালাই-এ ব্যবহারের জন্ম ওয়েষ্টার্ণ ম্যাচ ফ্যাকটরিরও নিজের একটা কাগজ কল আছে।

তিন

কাগজ শিল্পের প্রসারের সঙ্গে কাগজের উৎপাদনও বেড়ে গিয়েছে। শতাব্দীর গোড়াতে মোট বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২০ হাজার টন। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদন দাঁড়ায় ২৪ হাজার টন, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ হাজার টন, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬৭ হাজার টন, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯৮ হাজার টন ও বর্তমানে প্রায় দশ লক্ষ টন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ও প্রকাশন ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে কাগজ সব সময় সহজলভ্য নয়। তা ছাড়া negotiated price ছাড়া মিলের কাছ থেকে খুব উচ্চমানের কাগজ পাওয়া যায় না।

চার

এবার ছাপার কালির কথা কিছু বলা যাক। গোড়াতে তেলের সঙ্গে ভুষা মিশিয়ে ছাপার কালি তৈরি করা হত। ভুষার গুণাগুণের ওপর কালির গুণাগুণ নির্ভর করত। তারপর মুদ্রাকররা বিলাতি কালি ব্যবহার করতে শুরু করে। কোটস্ (Coates) ও ম্যাণ্ডারস্ (Manders)-এর কালিই মুদ্রাকররা পছন্দ করত। কিন্তু এদেশে কালি-শিল্পের অভ্যুদয়ের পর বিলাতি কালির আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যদিও ছোটখাটো আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, তা হলেও তিনটা বড় প্রতিষ্ঠানই কালির বাজারটা দখল করে রেখেছে। এ তিনটা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হুগলি প্রিন্টিং ইঙ্ক, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গ্যাঞ্জেস প্রিন্টিং ইঙ্ক ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কোটস্ অভ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমুদবিহারী সান্যাল ছাপার কালি তৈরির জন্য সান্যাল লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানি নামেও একটি সংস্থা স্থাপন করেন। এরা সকলেই এখনও জীবিত আছে। তবে এদের মধ্যে হুগলির কালিই বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

কাগজ ও কালির দাম বর্তমানে খুবই বেড়ে গেছে, যার ফলে মুদ্রণ ও প্রকাশন এই উভয় শিল্পেরই অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন চরিত্রের বই ছাপবার জন্য বিভিন্ন রকমের কাগজ ও কালির প্রয়োজন হয়। ছোট ছাপাখানাওয়ালারা এটা জানে না। তারা খরিদ্দারের ইচ্ছানুযায়ী কাগজ ও নিজের সুবিধামত কালি ব্যবহার করে। বিশিষ্ট মুদ্রাকররা কিন্তু তা করেন না। তাঁরা এ বিষয়ে খরিদ্দারকে পরামর্শ দেন। সেজন্য তাঁদের ছাপার সব সময়েই একটা বিশিষ্টতা থাকে। তবে চল্লিশ বছরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে অনেক ক্ষেত্রে বড় ছাপাখানাওয়ালাদেরও যথাযথ কাগজ ও কালি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাব দেখা যায়।

গ্রন্থ ও প্রকাশন

এক

এতক্ষণ হরফ, মুদ্রাযন্ত্র, ছাপার কাগজ ও কালি সম্বন্ধেই আমরা বলছিলাম। কিন্তু এদের সম্মিলনে এদেশে যে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে এখন বলব। শুধু একবার কল্পনা করুন, ছাপা বই বেরুবার আগে দেশের শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থাটা কি ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে ইওরোপের যে অবস্থা ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশেরও সেই অবস্থা ছিল। লোকের বিদ্যাবুদ্ধি যা কিছু, হাতে-লেখা পুথির মধ্যে ও বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। পুথি-গুলো আড়ভাবে কাগজে বা তালপাতার ওপর লেখা হত। আলগা পাতা-গুলোকে দুখানা কাঠের তক্তা বা পাটার মধ্যে রেখে কাপড় বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত। তালপাতার পুথির ক্ষেত্রে পাতাগুলির মাঝখানে একটা ফুটা থাকত। তার ভেতর দিয়ে সুতা বা দড়ি গলিয়ে দিয়ে পুথিখানা বাঁধা হত। কাগজ ও তালপাতা ছাড়া, আরও অনেক জিনিসের ওপর যেমন ভোজপাতা, তেরেটা পাতা, গাছের বাকল প্রভৃতির ওপরও বই লেখা হত। আমাদের বাঙলাদেশে পুথি যে বাংলা অক্ষরেই লেখা হত তা নয়। বাংলা ভাষার পুথি নাগরী, পারসি ও আরবি এবং অন্যান্য লিপিতেও লেখা হত।

তখনকার দিনে পুথি লেখা ও পুথিদান পুণ্য কর্ম বলে বিবেচিত হত। তবে পুথি লিখে অনেকে পয়সা উপায়ও করত। তাদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ দুই-ই ছিল। তবে তারা যে সাধারণতঃ খুব বেশি পয়সা পেত তা নয়। সেটা একখানা পুথির দাম দেখলেই বুঝতে পারা যায়। শ্রীরামপুরের ওয়ার্ড সাহেব উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যা দাম দেখেছিলেন, তার একটা হিসেব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে হাতে-লেখা 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ তিন টাকায় বিক্রি হত, যদি হাতের লেখা সুন্দর হত। আর তা না হলে নীচের দিকে দেড় টাকা পর্যন্ত। হাতে-লেখা 'অমরকোষ' তিন টাকায় বিক্রি হত। ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে নকল করবার জন্য লিপিকরদের বাত্রিশ হাজার অক্ষরের জন্য বারো আনা দেওয়া হত। অনেকে আবার টাকার সঙ্গে লিপি-

করদের এক জোড়া কাপড় ও মিষ্টান্ন দিত। অনেকের আবার যাবজ্জীবন ভরণপোষণের কথাও শোনা যায়।

পুথি জিনিসটা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধীনে থাকত। তারা বিদ্যা সম্বন্ধে 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে' এই নীতি অনুসরণ করত না। অপরকে তারা পড়তে বা অনুলিপি গ্রহণ করতে দিত না। সেজন্য অনেক পুথির শেষে অনুলিপিকারের ওপর অভিসম্পাত দেওয়া থাকত। এ অভিসম্পাতে তারা খুব কটুভাষা ব্যবহার করত। যেমন এসিয়াটিক সোসাইটির ৫২০৪ সংখ্যক পুথির শেষে লেখা আছে—'যত্নেন লিখিতং বেদং যশ্চোরয়তি পুস্তকম্। শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ।' সোসাইটির আর একখানা পুথিতে বংশলোপের ভয়ও দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে—'অর্জিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যঃ মেহনথ। হর্তুমিচ্ছত যঃ পাপী তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ।'

এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যার প্রসার যে এক অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাজের ওপর ছাপাখানার গভীর প্রতিঘাত পড়েছিল এখানেই। ছাপাখানা মুদ্রিত বইয়ের সাহায্যে জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষাকে সার্বজনীন বা democratised করে তুলেছিল। সেজন্য সনাতনীদের ছাপাখানার ওপর এক প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। তারা ছাপা বইকে যে মাত্র অস্পৃশ্য বলে মনে করত তা নয়; ছাপা বইয়ের দিকে তাকানোও পাপ বলে মনে করত। তাঁদের কাছে বিলাতি যা কিছু এদেশে প্রবর্তিত হচ্ছিল, সবই হিন্দু ধর্মকে নষ্ট করবার জন্য। (অথচ এই ভণ্ড তপস্বীরা বাঙলার হিন্দু রমণীদের বিদেশীর দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি)। তাদের কাছে ছাপাখানাটা ছিল হিন্দু ধর্মকে নষ্ট করবার একটা যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু ছাপাখানা সমাজের ওপর যে গভীর প্রতিঘাত হেনেছিল, তাতে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ছাপাখানা থেকে যখন হুড় হুড় করে বই বেরুতে লাগল, ও দেশের জনসাধারণ তা কিনে পড়তে লাগল, তখন তার স্রোতে ছাপাবই-বিদ্রোহী সনাতনীরাই ভেসে গেল।

ছাপাখানার প্রথম যুগের এই বিদ্বেষটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। শিক্ষাকে সার্বজনীয়তার রূপ দেবার প্রচেষ্টার বিরোধী এসকল পাষণ্ড সনাতনী ইতিহাসের অতল গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

দুই

প্রথম বাংলা বই ছাপা হয়েছিল হুগলিতে নয়, লিসবন ও লণ্ডনে। তবে সেগুলো ছাপা হয়েছিল বাংলা হরফে নয়, রোমান হরফে। তার মধ্যে তিন-খানা ছাপা হয়েছিল লিসবনে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। বই তিনখানার নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' ও একখানা বাংলা ব্যাকরণ ও পোর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক' বইখানার লেখক ছিলেন একজন বাঙালি। তাঁর আসল নাম আমাদের জানা নেই। বলা হয়, তিনি ভূষণার রাজকুমার, মগ দস্যুদের হাত থেকে তাঁকে এক পোর্তুগীজ পাদ্রি রক্ষা করে তাঁকে রোমান-ক্যাথলিক করেছিল। তখন তাঁর নাম হয়েছিল দোম আন্তনিয়ো দ রোজারিও। অপর বই দুটির লেখক পাদ্রি মানোয়েল-দা-আসুম্পসাম। এ ছাড়া ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ছাপা হয়েছিল ডিসুজা রচিত 'প্রশ্নোত্তর-মালা' ও 'প্রার্থনামালা'। বাংলা হরফ তৈরির পরেও রোমান হরফে বাংলা বই ছাপা হয়েছিল ১৮০৩ ও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতায়।

হ্যালহেডের 'গ্রামার' ছাপা হবার পর, ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হল অনারেবল কোম্পানির ছাপাখানায় জোনাথন ডানকান সাহেবের 'ইম্‌পে কোড'। ১৭৯১ ও ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এডমনষ্টোন সাহেব ছাপালেন বই আকারে আরও দুটি আইনের তর্জমা। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে আরও ছাপা হল উইলিয়াম জোন্‌সের 'ঋতুসংহার' বাংলা অক্ষরে, ও এ. আপজনের 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি' (১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনিই প্রকাশ করেছিলেন কলকাতার বিখ্যাত মানচিত্র)। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরষ্টার ছাপালেন 'কর্নওয়ালিস কোড'-এর বাংলা অনুবাদ। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হল জন মিলারের 'সিক্ষ্যাগুরু'। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরষ্টার ছাপালেন তার বিখ্যাত 'ভোকাবুলারি'।

কিন্তু এ পর্যন্ত যা বই ছাপা হল, তা ফিরিঙ্গিদের উপকারার্থে বা শাসন কার্যের সুবিধার জন্য। সাধারণের পাঠোপযোগী বই ছাপা হল উনবিংশ শতাব্দীর চাকা ঘোরবার পর থেকে। এ বিষয় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারিরা, যদিও প্রথম যে সকল বই তাঁরা বের করেছিলেন, সেগুলো ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মপুস্তক। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে কেরি বের করলেন তাঁর ১২৫ পাতার বই 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত'। তার পরের

বছর বেরুল ৮০০ পাতার বাইবেলের অনুবাদ 'ধর্মপুস্তক'। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যে মাত্র খ্রীষ্টধর্মের বই বের করলেন, তা নয়। এ দেশের জনপ্রিয় বইগুলো যা আগে লোক হাতে লিখে পড়তো, যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' ইত্যাদিও শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ছেপে বের করতে লাগলেন। মৌলিকভাবে রচিত গ্রন্থও প্রকাশিত হতে লাগল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু বের করলেন তাঁর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। এখানাই বাঙালি-রচিত বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় বের করলেন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'। এইভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটতে শুরু হল।

পুস্তক মুদ্রণ শুরু হবার পর বাংলা পুথির যুগ শেষ হয়ে গেল। হাতে-লেখা বাংলা হরফে লেখা পুথির বয়স ১২০০।১৩০০ বছর হবে। পুথিগুলো লেখা হত, মাত্র বাংলা অক্ষরে নয়; নানা রকম অক্ষরে। আজ পর্যন্ত নয় রকম অক্ষরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ কথা আগের অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। পুথিগুলো সাধারণতঃ লেখা হত লম্বা কাগজের আড়ের দিকে। পদ্য রচনা, লাইন হিসাবে লেখা হত না। লম্বা লিখে যাওয়া হত, যাকে আজকের দিনে আমরা run on বলি। সাধারণতঃ মুদির দোকানে বা সমগোত্রীয় স্থানে বাংলা কাব্যসমূহ সুর করে পড়া হত। অনেক সময় তাদের কাছে সমগ্র কাব্যখানা থাকতো না, থাকতো অংশ বিশেষ মাত্র।

মুদ্রণ শুরু হবার পর সমস্ত পরিস্থিতিটাই পালটে গেল। যদিও মুদ্রণ শুরু হবার পরেও পুথির ঢঙে বই ছাপা হয়েছে, তা হলেও গোড়া থেকেই বই পাশ্চাত্য দেশের কায়দাতেই ছাপা হতে আরম্ভ হয়েছিল। মুদ্রণের বৈপ্লবিক কৃতিত্ব হচ্ছে সেখানেই। এখন থেকে আমরা বিলাতি কায়দায় ছাপান বাঁধাই করা বই পেতে শুরু করি। যদিও রক্ষণশীল সনাতনী সমাজ গোড়ার দিকে এর বিরোধিতা করেছিল, তথাপি সে প্রতিরোধ টেকে নি।

তিন

শীঘ্রই স্রোতের বাঁধ ভেঙে গিয়ে এল বইয়ের বন্যা। শতাব্দীর প্রথম বিশ বছরের মধ্যে বেরুল নানা রকমের বই, নানা ছাপাখানা থেকে। এমন কি চিকিৎসা-

শাস্ত্র-সম্পর্কিত বই ও পঞ্জিকাও এর মধ্যে ছিল। যেসব বই বেরুল, তার মধ্যে উল্লেখনীয় হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি', হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা', ফিলিকস্ কেরির 'ইংলণ্ড দেশের বিবরণ', মিস সাহেবের 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস', উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা', কালাচাঁদ বসুর 'সহমরণ', ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'অন্নদামঙ্গল', রামমোহন রায়ের অনেক ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কেরির, এবং রামমোহন রায়ের 'বাংলা ব্যাকরণ', ফিলিক্স্ কেরির 'বিদ্যাহারাবলী'। এরই মধ্যে প্রকাশিত হতে লাগল বটতলার সস্তাদামের বই।

১৮১৬ থেকে ১৮২১-এর মধ্যে বেরুল কতগুলো বিশিষ্ট বই। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' বের করলেন। এই পুস্তকেই প্রথম ছবির ব্লক ব্যবহার করা হল। এখানাই স্মরণীয় হয়ে আছে প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক হিসাবে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর বের করলেন তাঁর 'ইংরাজি বর্ণমালা', পীতাম্বর শর্মা তাঁর অভিধান, রামমোহন রায় তাঁর 'সহমরণ'। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বেরুল বৈকুণ্ঠলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা', উইলসনের 'সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধান', রামকমল সেনের 'ঔষধ রসায়ন-সংগ্রহ' ইত্যাদি।

চার

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ বিশেষভাবে চিহ্নিত হল বাংলা প্রকাশনের ইতিহাসে। কেন না ওই বছর বেরুল প্রথম বাংলা পঞ্জিকা। নানারূপ ধর্মকর্ম ও সামাজিক ও পরিবারিক অনুষ্ঠান পালন সম্পর্কে পঞ্জিকা হিন্দুর কাছে অপরিহার্য। এ ছাড়া, পঞ্জিকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরও প্রয়োজন হত হিন্দুপর্বের দিনে সরকারি অফিস বন্ধ রাখবার জন্য। এক সরকারি নোটিশ থেকে আমরা জানতে পারি যে নিম্নলিখিত পর্বের দিনসমূহে সরকারি কার্যালয়সমূহ একেবারে বন্ধ থাকত—রথযাত্রা ১ দিন, পুনর্যাত্রা ১ দিন, রাখীপূর্ণিমা ১ দিন, জন্মাষ্টমী ২ দিন, দুর্গাষ্টমী ২ দিন, মহালয়া ১ দিন, দুর্গাপূজা ৫ দিন, দেওয়ালী ৩ দিন, উত্থান একাদশী ২ দিন, তিলওয়া সংক্রান্তি ১ দিন, বসন্ত পঞ্চমী ১ দিন, শিবরাত্রি ২ দিন, হোলি ৫ দিন, বারুণী ১ দিন, চড়ক পূজা ১ দিন, রামনবমী ১ দিন। এটা হচ্ছে ১১৯৪ বঙ্গাব্দের ছুটির তালিকা। ওই তালিকার শেষে আরও লেখা ছিল যে প্রয়োজন

হলে নিম্নলিখিত দিনসমূহেও ছুটি পাওয়া যাবে—অক্ষয় তৃতীয়া ১ দিন, নৃসিংহ চতুর্দশী ২ দিন, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশমী-একাদশী ২ দিন, স্নানযাত্রা ১ দিন, শয়ন একাদশী ১ দিন, অরন্ধন ১ দিন, গণেশ পূজা ১ দিন, অনন্তব্রত ১ দিন, বুধনবমী ১ দিন, নবরাত্রি ১ দিন, লক্ষ্মীপূজা ১ দিন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১ দিন, অন্নকুট যাত্রা ১ দিন, কার্তিক পূজা ১ দিন, জগদ্ধাত্রী পূজা ১ দিন, রাসযাত্রা ১ দিন, অগ্রহায়ণ নবমী ১ দিন, রটন্তী অমাবস্যা ২ দিন, মৌনী সপ্তমী ১ দিন, ভীমাষ্টমী ১ দিন ও বাসন্তী পূজা ৪ দিন। এ ছাড়া, গ্রহণাদির দিনও ছুটি থাকত। তার আভাস আমরা 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশিত এক খবর থেকে পাই। তাতে বলা হয়েছিল—'এতদ্দেশীয় নবদ্বীপ, ও মৌলা ও বারইখালি ও বাকলা ও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে কতক আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি ছাপান যাইবেক।' আগে পঞ্জিকা হাতেই লেখা হত। সেই সকল পঞ্জিকার লিখনপদ্ধতি নিম্নরূপ ছিল—

৭	২	১
৪	১৬	৫৫
১৩	২৭	২৭
৯	৭	৮

প্রথম স্তম্ভে প্রথম সংখ্যা হচ্ছে বার। এক্ষেত্রে ৭ হচ্ছে শনিবার, তার নীচে ৪ হচ্ছে চতুর্থী তিথি, আর তার নীচের সংখ্যাদ্বয় হচ্ছে ১৩ দণ্ড ৯ পল পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তম্ভে ২ অর্থে ভরণী নক্ষত্র, তার নীচের সংখ্যাদ্বয় হচ্ছে ১৬ দণ্ড ২৭ পল পর্যন্ত, আর তার নীচের সংখ্যা ৭ হচ্ছে বিষ্টিকরণ। তৃতীয় স্তম্ভে ১ অর্থে বিষ্কুম্ভ যোগ, তার নীচের দুই সংখ্যা হচ্ছে ৫৫ দণ্ড ও ২৭ পল পর্যন্ত। আর তার নীচে ৮ হচ্ছে মাসের তারিখ সংখ্যা। এইসকল পঞ্জিকা টোলসমূহে রক্ষিত হত, এবং টোলের পণ্ডিতেরাই সাধারণের কাছে এর ব্যাখ্যা করতেন ও বিধান দিতেন।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে পঞ্জিকার মুদ্রণ জ্যোতিষিক তথ্যসমূহকে সাধারণের কাছে পৌছে দিয়েছিল। তবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২২৫ বঙ্গাব্দের যে পঞ্জিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তা যদিও আজকালকার ছাঁদেই ছাপা হয়েছিল

তথাপি তাতে অনেক কিছু ছিল না। সেগুলার অনুপ্রবেশ পরবর্তী কালের পঞ্জিকাসমূহে ঘটেছিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পঞ্জিকার প্রতিলিপি থেকে দেখা যায় যে উহাতে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি তারিখ দেওয়া আছে, কিন্তু মুসলমানি তারিখের উল্লেখ নেই। এ ছাড়া বারবেলা, কালবেলা, মৃতে কি পরিমাণ দোষপ্রাপ্তি, জন্মে কি রাশি ইত্যাদি নেই। বিবাহ অন্নপ্রাশনের তারিখের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কাল, লগ্ন ও যোগের উল্লেখ নেই। এগুলা পরেকার পঞ্জিকায় সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

তার পরের তিরিশ বছরের মধ্যে একাধিক পঞ্জিকা প্রকাশ হতে শুরু হয়েছিল। কেন না ১২৬৩ বঙ্গাব্দে আমরা ন্যূনপক্ষে ছয়খানা পঞ্জিকা প্রকাশ হতে দেখি। এগুলা প্রকাশিত হয়েছিল স্যাণ্ডারস্ কোনজ, চন্দ্রোদয় প্রেস, সত্যার্ণব প্রেস, নৃত্যলাল শীল, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রেস, ও হরিহর যন্ত্র থেকে। লঙ সাহেব বলে গেছেন যে এগুলার প্রচার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ৩৫ হাজার। একাধিক পঞ্জিকা দেখে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। কেন না, বর্তমানেও আট দশখানা পঞ্জিকা বাজারে চালু আছে, বর্তমানে প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহের মধ্যে গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখন বাংলায় মুসলমানি পঞ্জিকাও প্রকাশিত হয়। পঞ্জিকাগুলির নানারূপ ক্রমোন্নতি ঘটলেও, এক বিষয়ে তাদের রক্ষণশীলতা লক্ষ্য করা যায়। সেটা হচ্ছে ছবিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ১লা বৈশাখ নতুন খাতা মহরতের ছবি ১২২ বছর পূর্বেও যেরূপ ছাপা হত, এখনও তাই হয়, যদিও বাস্তব জগতের সঙ্গে সে ছবির কোন মিল নেই।

পাঁচ

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা সংস্কৃত ও বাংলা বইয়ের মূল্য প্রদর্শিত হয়েছে। তা থেকে দেখা যায় যে বইয়ের দাম খুব বেশি নয়। সস্তায় ছাপা বই হাতে পাওয়ায় শিক্ষার প্রসার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ দিকে শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক বিদ্যায়তনও স্থাপিত হয়েছিল। সূচনা থেকেই শ্রীরাম-পুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন বহু বিদ্যালয় স্থাপন করতে শুরু করেছিল। বস্তুতঃ মিশন যন্ত্র ও বাংলা বিদ্যালয় খোলার ব্যাপার নিয়েই তাঁরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম

বসুকে নিযুক্ত করেছিলেন। মিশন শ্রীরামপুর ও তার আশেপাশে কয়েক শত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। এদিকে কলকাতাতেও অন্যান্য মিশনারিরা শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ডেভিড ড্রামণ্ড নামে এক স্কচ প্রেসবিটারিয়ান যুক্তিবাদী খ্রীষ্টানের স্কুল 'ধর্মতলা একাডেমি' নামে পরিচিত ছিল। এখানেই হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও শিক্ষালাভ করেছিলেন। তবে এই সব বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে খ্রীষ্টান যাজকরা খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধেও শিক্ষাদান করতেন। এই কারণে, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরমোহন আঢ্য 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি' স্কুল স্থাপন করে ছাত্রদের মন খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল ও স্কুল বুক সোসাইটির চেষ্টাতেও দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন হতে শুরু হয়েছিল।

ছয়

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্থাপিত হয়েছিল স্কুল বুক সোসাইটি। নানাবিধ পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশন দ্বারা শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদপত্রে লিখিত হল—'এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে। যে হেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সর্বদেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্বরা করে, সেই মত ছাপার পুস্তক ক্রমে ক্রমে সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহাদের মন উচ্চাভিলাষি করে। পূর্বকালে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তালপত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল। ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে।'

দেশের ধনী লোকেরাও সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য নানা রকম বই লিখতে লাগলেন। রামমোহন রায় তো একখানা বাংলা ব্যাকরণ লিখলেনই, রাধাকান্ত দেবও ১২৮ পাতার এক অপূর্ব বই লিখলেন। এই বইখানাতে 'বর্ণমালা, বর্ণউচ্চারণ, শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ, ব্যাকরণ, মনুষ্যদের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ও পদ্ধতি, মিত্রলাভ ও সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি, চারিপ্রকার

রাজাদের উপায়, অঙ্ক সংখ্যা, কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্তমান কাল পর্যন্ত দিল্লীতে যিনি যিনি সাম্রাজ্য করেছেন তাঁদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্তমান পর্যন্ত যিনি যিনি যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন, তাঁহারদিগের স্থূল বিবরণ' প্রভৃতি ছিল। অনেকে আবার ঘরের পয়সা খরচ করে বই ছাপিয়ে, বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস। তিনি জ্যোতিষ সম্বন্ধে একখানা বই ও 'শব্দাম্বুধি' নামে একখানা অভিধান ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করলেন। এ ছাড়া তিনি পণ্ডিতগণের দ্বারা সম্পাদনা করিয়ে বহু পরিশ্রমে ও বহুব্যয়ে মুদ্রিত করে বিতরণ করেছিলেন মুণ্ডমালা, মৎস্যসূক্ত, মহিষমর্দিনী মায়াতন্ত্র, ও মাতৃকাভেদ মাতৃকোদয় ও মহানির্বাণ মালিনীবিজয় মহানীলতন্ত্র, মহাকাল সংহিতা, মেরুতন্ত্র ও ভৈরবী ভূতডামর, বীরভদ্র বীজচিন্তামণি, একজটা নির্বাণ তন্ত্র, ও তারারহস্য, শ্যামারহস্য ইত্যাদি তন্ত্র ও নারদ পঞ্চরাত্র ও শ্রুতিস্মৃতি সংগ্রহাদি সংগ্রহ করে 'প্রাণতোষিণী' নামধেয় লতা নামে এক গ্রন্থ। আরও যাঁরা নিজের পয়সায় ছাপিয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল, উমানন্দ ঠাকুর, মহারাজ কালীকৃষ্ণ দেব প্রমুখ।

মোট কথা ছাপার কাজ খুব দ্রুতই এগিয়ে চলেছিল। ১৮২৪ খ্রীঃ কলকাতার বিভিন্ন ছাপাখানায় যেসব বই মুদ্রিত হয়েছিল, তার একটা তালিকা এখানে দেওয়া খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এইসকল বইয়ের মধ্যে আছে কলুটোলা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কৃত পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার, ও শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার কৃত আনন্দলহরীর সংস্কৃত সমেত ভাষা; বহুবাজারে শ্রীলেবেণ্ডার সাহেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কৃত মিতাক্ষরাদর্পণ নামক মিতাক্ষরা গ্রন্থের তর্জমা সংস্কৃত সমেত ভাষা, ও শ্রীলেবেণ্ডার সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত 'জানসেন ডিকস্যানরীর ইংরাজি সমেত বাঙ্‌লা'; মিরজাপুরের সম্বাদ তিমিরনাশক ছাপাখানায় মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস কৃত জ্যোতিষ দিন-কৌমুদী, রতিমঞ্জরী, তর্পণ এবং শূদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রণাম-শিক্ষা বিবরণ, পদাঙ্কদূত পঞ্চাঙ্গসুন্দরী, আনন্দলহরীর পয়ার ও রাধিকামঙ্গল; শাখারিটোলার মহেন্দ্রলাল ছাপাখানায় মুদ্রিত শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ কৃত বত্রিশ সিংহাসন,

শ্রীবদনচন্দ্র পালিত কৃত নারদসম্বাদ ; মিরজাপুরে মুনসী হেদাতুল্লার ছাপাখানায় ছাপা শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় কৃত লেভিরূল নামে পারসি, ইংরাজি, বাঙ্গলাতে এক কেতাব ; আরপুলির ছাপাখানায় শ্রীবারাণসী আচার্য কর্তৃক মুদ্রিত কালীর সহস্র নাম, বিষ্ণুর সহস্র নাম, রাধিকার সহস্র নাম, হনুমচ্চরিত্র ও কাকচরিত্র ও চক্ষুরাদি স্পন্দনের ফলাফলসূচক এক গ্রন্থ, এবং ওই ব্যক্তি কৃত জ্যোতিষের এক তর্জমা গ্রন্থ ; শ্রীমন্ত রায় কর্তৃক মুদ্রিত ভগবদ্‌গীতা ও তার ভাষ্য, এবং বহড়ার শ্রী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কৃত দ্রব্যগুণ ভাষা। ওর পরের বছরেই কেরি সাহেব শ্রীরামপুর থেকে বের করেছিলেন একখানা বাংলা-ইংরেজি অভিধান ও রাম-কমল সেন কৃত জনসনের ইংরেজি অভিধানের বাংলা তর্জমা, কোল্‌ব্রুক সাহেবের অমরকোষের পুনর্মুদ্রণ, কপিলদেব কৃত সাংখ্যসূত্র ও নীলরত্ন হালদারের বহুদর্শন। ওই বৎসরেই নীলরত্ন হালদার অপর জায়গায় ছাপিয়েছিলেন জ্যোতিষ সম্বন্ধে একখানা বই, ও ডক্টর ব্রিটন সাহেব একখানা পাঁচভাষাতে রচিত শরীর ও তাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম তর্জমা। ওই সালেই উক্ত নীলরত্ন হালদার মহাশয় বাংলা, পারসি, আরবি, ইংরেজি ও ল্যাটিন ভাষায় প্রচলিত প্রবচনের একখানা সংকলন-পুস্তকও শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপিয়েছিলেন, দাম তিন টাকা। **ওই ১৮২৫** খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল মহাশয় কলকাতার চন্দ্রিকা যন্ত্রে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড ছাপিয়ে মাত্র আট আনা দামে বেচেছিলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ আরও স্মরণীয় হয়ে আছে এই কারণে যে ওই বছরেই সক্ সাহেব কলকাতার (ইংরেজিতে কলকাতার ম্যাপ প্রথম তৈরি করেন ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মট সাহেব ; ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বেইলি ও তার ১৮ মাস পরে অ্যারণ আপজন) আর প্রিনসেপ্ সাহেব কাশীধামের ম্যাপ বা নকশা প্রকাশ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খাজরি থেকে কানপুর পর্যন্ত গঙ্গা নদীর একখানা ম্যাপ ও বাংলা অক্ষরে ভারতবর্ষের নানাদেশ, নদী, পর্বত ও নগর প্রভৃতির নাম দিয়ে এক-খানা মানচিত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার ছোট আদালতের বিচারপতি শ্রীযুক্ত সি. কে. ব্যারিসন (রবিনসন ?) গৃহনির্মাণ সম্বন্ধেও একখানা বই ওই সালেই প্রকাশ করেছিলেন।

সাত

ছাপা ও পুস্তক প্রকাশনের কাজ এত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছিল যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বইয়ের তালিকা থেকে। ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল—

ক। কলুটোলা চন্দ্রিকা আপিসে মুদ্রিত (১) শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের তাৎপর্যসূচক পুরাণ বোধোদ্দীপন ভাষা। (২) শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নায়িকাবিষয়ক বিলাস নামক গ্রন্থ। (৩) মাধবশর্মা রচিত শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ভাষা বিবরণ ও ভাগবতসার। (৪) বেতাল পঞ্চবিংশতি (দ্বিতীয় মুদ্রণ)। (৫) হরগোবিন্দ দত্ত কৃত সাত্বত সভাপ্রবেশ নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

খ। আরপুলি শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে মুদ্রিত (১) শ্রীনন্দকুমার দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত 'চৌরপঞ্চাশিকা'। (২) শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চাণক্যশ্লোক'। (৩) শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'শৃঙ্গার তিলক'। (৪) শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'মোহমুদ্গর'। (৫) শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভাষা সমেত 'দায়ভাগ'।

গ। বহুবাজার লেবেণ্ডার সাহেবের প্রেসে মুদ্রিত (১) শ্রীরামস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত বাহ্কটাধ্বারি নামক মহাকবির 'বিশ্বরূপদর্শন'। (২) সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার কর্তৃক রচিত 'দায়ভাগসংগ্রহ'। (৩) জানসেন ডিকসিয়ানারী বাংলা সমেত।

ঘ। মিরজাপুর সম্বাদ তিমিরনাশক প্রেসে মুদ্রিত (১) শ্রীতারাচাঁদ ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত মার্কেণ্ডয়পুরাণান্তর্গত 'চণ্ডী'। (২) নারদ সম্বাদ।

ঙ। শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে মুদ্রিত (১) বত্রিশ সিংহাসন। (২) রাধামোহন সেন কৃত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'।

চ। এনটালি শ্রীযুক্ত পিয়র্স সাহেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত (১) নীলের আইন। (২) মনোরঞ্জন ইতিহাস (পুনর্মুদ্রণ) (নাগর অক্ষর)। (৩) আদম সাহেব কৃত পাঠশালার রীতি। (৪) আদম সাহেব কৃত 'উপদেশ কথা'। (৫) ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত 'বর্ণমালা' (পুনর্মুদ্রণ)। (৬) তারিণীচরণ মিত্র কৃত গোলাধ্যায় পঞ্চমভাগ। (৭) কিট্ সাহেব কৃত 'ব্যাকরণ'।

ছ। সমশুল আখবার প্রেসে মুদ্রিত (১) জহুরি অর্থাৎ দেশের বিবরণ, বাদশাহী বিবরণ ইত্যাদি। (২) তৌকিয়াত কিসরা এবং মারফিয়ত ওজবা অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশের কথা। (৩) দস্তরল এনসা অর্থাৎ পত্রাদি লিখনের ধারা। (৪) এয়ার মহম্মদ অর্থাৎ শ্যাখৎ।

জ। কলেজ প্রেসে মুদ্রিত 'ব্যাকরণ'।

ঝ। শ্রীরামপুরের শ্রীযুত নীলমণি হালদারের ছাপাখানায় মুদ্রিত (১) কবিতা-রত্নাকর। (২) জ্যোতিষ।

ঞ। শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় মুদ্রিত (১) ভাষা ব্যাকরণ। (২) ভারতবর্ষের ইতিহাস। (৩) ভাষা অভিধান। (৪) পারসি ও বাঙ্গালা আইন। (৫) বোপদেব কৃত 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ'।

ট। শ্রীরাম তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত চাতকাষ্টক ইত্যাদি সংগ্রহ।

এ সময় রাজা রামমোহন রায়ও কয়েকখানি বই প্রকাশ করেছিলেন। এগুলো বিভিন্ন ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছিল, যথা (১) কলকাতার ফেরিস অ্যাণ্ড কোম্পানি কর্তৃক মুদ্রিত 'বেদান্ত গ্রন্থ'; (২) ১নং মিশন রো-স্থিত গভর্নমেণ্ট গেজেট প্রেসে মুদ্রিত 'বেদান্তসার'; (৩) বাঙ্গালি প্রেসে মুদ্রিত কঠোপনিষৎ; (৪) ক্যালকাটা মিশন প্রেসে মুদ্রিত 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ'; (৫) হরচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত 'কবিতাকারের সহিত বিচার'; (৬) সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত 'পথ্য প্রদান'; (৭) স্কুল বুক সোসাইটি প্রেসে মুদ্রিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'; (৮) সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে মুদ্রিত পাষণ্ড পীড়ন ও (৯) তুহফত-উল-মুওয়াহদ্দিন।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২ মার্চ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যায় যে 'পরে লিখিত পুস্তকগুলি চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে এবং যাহার প্রয়োজন ওই যন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারে'—কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডী মূল্য ৬ টাকা, ভগবদগীতা ৫ টাকা, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ৩ টাকা, রামায়ণ আদিকাণ্ড ভাষা ৩ টাকা, জয়দেব ৩ টাকা, অন্নদামঙ্গল ৪ টাকা, বিদ্যাসুন্দর ২ টাকা, চন্দ্রকান্ত ২ টাকা, চন্দ্রবংশোদয় ২ টাকা, দণ্ডিপর্ব ৩ টাকা, হাতেমতাই ৪ টাকা, তুতিনামা ২ টাকা, উষাহরণ দুই টাকা, সারদামঙ্গল একটাকা চার আনা, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী এক টাকা, কৌতুকসর্বস্ব

নাটক এক টাকা, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক দুই টাকা, নলদময়ন্তী উপাখ্যান এক টাকা, রত্নমালা তিন টাকা, রাস পঞ্চাধ্যায় দুই টাকা, চোরপঞ্চাশিকা দুই টাকা, কবিতা-রত্নাকর তিন টাকা, পার্সি ও ইংরাজি ডেক্সনারি ছয় টাকা, হিতোপদেশ তিন টাকা আট আনা, রোগান্তকসার দুই টাকা, বেতাল পঞ্চবিংশতি দুই টাকা, ন্যায়দর্শন তিন টাকা, কলিকাতা কমলালয় এক টাকা, নববাবুবিলাস এক টাকা, দূতীবিলাস দুই টাকা, পদ্মপুরাণন্তর্গত ক্রিয়াযোগসার মাধব-সুলোচনা উপাখ্যান এক টাকা, আনন্দলহরী এক টাকা, বিদগ্ধ মুখমণ্ডল চার আনা, রসমঞ্জরী আট আনা, প্রাচীন পদ্যাবলী আট আনা, তীর্থকৈবল্যদায়ক চার আনা, আদিরস চার আনা, সংসারসার আট আনা, লক্ষ্মীচরিত্র চার আনা, চাণক্যশ্লোক চার আনা, শঙ্করী গীতা আট আনা, মহিম্নস্তব আট আনা, গঙ্গার স্তোত্র চার আনা, শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌সার সাড়ে ছয় টাকা, বত্রিশ সিংহাসন তিন টাকা, ১২৩৮ সালের পঞ্জিকা এক টাকা, জ্ঞানকৌমুদী তিন টাকা, ভগবতী গীতা দুই টাকা ও মাধবী-মালতীর উপাখ্যান তিন টাকা। এই তালিকায় মোট ৫৭ খানা বই ছিল।

এর আগের বছর (১৮৩০) চন্দ্রিকা-সম্পাদক ছাপিয়েছিলেন শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক সংস্করণ। এতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১৮,০০০ শ্লোক ও শ্রীধর স্বামীর ২৪,০০০ শ্লোকে সমাপ্ত টীকা ছিল। বইখানাতে বড় অক্ষরে মূল ও ছোট অক্ষরে টীকা তুলাত কাগজে প্রাচীন পুস্তকের ধারামত ৫০০ পৃষ্ঠা ছিল। পরের বৎসর (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে) চন্দ্রিকা-প্রকাশক আরও মুদ্রিত করেন মনুসংহিতার এক সঠিক সংস্করণ।

বস্তুতঃ বাংলা বইয়ের রচনা, প্রকাশন ও বিপণন ক্ষেত্রে এ সময় 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা হিসাবে তিনি তিনখানি ব্যঙ্গবিদ্রূপময় সরস সামাজিক গ্রন্থ রচনা করে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এ বই তিনখানি হচ্ছে 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (প্রমথনাথ শর্মণ্ ছদ্মনামে লিখিত ১৮২৫) ও 'নববিবিবিলাস' (ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে লিখিত ১৮৩১)।

আট

এই সময় পুস্তক প্রকাশনে শোভাবাজারের মহারাজ কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তিনি যে মাত্র সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, তা নয়; সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদসমূহও বের করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর অন্যতম ছিল পুরুষপরীক্ষা, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, বেতাল পঁচিশ, সংস্কৃত আদি মহানাটক ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ থেকে সংকলিত নীতিকথা ও উত্তমা বিদ্যাচয়। এ ছাড়া, তিনি 'সংক্ষিপ্ত সদ্‌বিদ্যাবলী' অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি বইও মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। এছাড়া, তিনি মুদ্রিত করিয়েছিলেন 'মজময়ন লতায়েক' অর্থাৎ ইতিহাস সংকলন নামক স্বানুবাদিত একখানি গ্রন্থ, পয়ারছন্দে অনূদিত গে সাহেবের ইতিহাস ও পাথুরিয়া ছাপাখানায় প্রস্তুত গ্রহাদির ছবি। তাঁর পিসেমহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছাপিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ১৮৩০ এর দশকে অনুবাদ সাহিত্যের দ্বারা জ্ঞানবিজ্ঞানের আদান-প্রদানের এক সক্রিয় অভিযান চলেছিল। এদেশীয় বই যেমন ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল, ইংরেজি বই-ও বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। জনসনের 'রাসেলাস' বই-এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন মহারাজ কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর নিজে। হরিমোহন সেন বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন 'আর‍্যাবিয়ান নাইট'-এর গল্পাবলী। বাংলায় আরও অনূদিত হয়েছিল মরিস সাহেবের 'গ্রামার'। আরও যেসব বই ১৮৩০-এর দশকে বাংলায় অনূদিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ড. রবার্ট ডগলেস সাহেবের ইংরেজি চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদ, হলধর সেন কৃত ইংরেজি গণিত পুস্তকের বাংলা অনুবাদ, এবং মার্শম্যান সাহেবের বাঙলাদেশের ইতিহাস ও ঈসপস্ ফেবলের বাংলা অনুবাদ।

১৮৩০-এর দশকে আরও প্রকাশিত হয়েছিল 'বিবিবিলাস' ও 'ভর্তৃহরিশতক', নন্দকুমার কবিরত্ন বিরচিত 'বৈদ্যোৎপত্তি', রাজনারায়ণ মুনসি প্রণীত 'বৈদ্য-বোধোদয়', রামমোহন রায় কৃত দায়ভাগ সম্পর্কিত একখানা বই, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কৃত নানাবিধ ছন্দ প্রবন্ধে 'মহাভারত দর্পন' ও 'হিতোপদেশ', স্যার উইলিয়াম জোনস্-কৃত কুল্লুক ভট্টের টীকা সমেত 'মনুসংহিতা', বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রকাশিত 'মনুসংহিতা', যজ্ঞরাম ফুকুন কর্তৃক বাংলা পদ্যে

ইংরেজি পদ্যের অনুবাদ, চন্দ্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত 'অন্নদাস্তূপ' নামক গ্রন্থ, গয়া ও কামাখ্যা তীর্থাদি সম্পর্কিত গ্রন্থাদি, শ্রীরামপুর দর্পণ যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত 'অমরকোষ', ও ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাস, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক কৃত মূল সমেত বাংলায় অনূদিত 'অমরকোষ', মতিলাল শীলের আনুকূল্যে 'বিপ্রভক্তিচন্দ্রিকা', ভবাণীচরণ তর্কভূষণ কৃত 'জ্ঞানরসতরঙ্গিণী'; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র পুনর্মুদ্রণ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত 'ছন্দোমঞ্জরী' ও 'বৃত্তরত্নাবলী', শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'দম্পতী শিক্ষা' ও রঘুনন্দনের বিধিসমূহ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রের পুনর্মুদ্রণ, বাবু শিবচন্দ্র কর্তৃক রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভুবনমোহন মিত্র কর্তৃক অ্যাটলাস বা মানচিত্র, কলকাতার একখানা মেডিক্যাল টপোগ্রাফি, সংস্কৃত কলেজের এক অধ্যাপক কর্তৃক সংকলিত 'খোস গল্পসার' ও বিবিধ অভিধান ও পঞ্জিকা। ১৮৩০ দশকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুস্তকমূল্যের সুলভতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তার দাম ছিল পাঁচ টাকা। কিন্তু ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ওর পুনর্মুদ্রণ হয়, তখন ওর দাম ধার্য করা হয় মাত্র আট আনা।

মোট কথা, বইয়ের দাম সস্তা হওয়ায়, বই ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। লঙ সাহেবের ফিরিস্তি অনুযায়ী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় বই ছাপা হয়েছিল ৫০ খানা; ১৮২২ থেকে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ২৮ খানা; ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে নূতন বাংলা বই ছাপা হয়েছিল ৫০ খানা; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩২২ খানা।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লঙ সাহেব তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর একটা তালিকা বের করেছিলেন। তাতে মোট ৯১৭ খানা বই ও সাময়িক পত্র ছিল। সাময়িক পত্রের সংখ্যা ৫৭। সুতরাং বইয়ের সংখ্যা ৮৬০। তার মধ্যে খ্রীষ্টধর্মী বই ১৬৪ খানা। বাকি ৬৯৬ খানা নানা বিষয়ক বই। তার মধ্যে গল্প ও উপাখ্যান ৫১, পৌরাণিক বই ১৪২, কাব্যশাস্ত্র ৬২, পদার্থ ও অন্যান্য বিজ্ঞান ৪২, বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ ৩৬, বৈষ্ণব গ্রন্থ ৪৫, শব্দশাস্ত্র ৪, ইতিহাস ২৫, ভূগোল ৯, অঙ্কপুস্তক ৭, জ্যোতিষ ৯, চিত্রাঙ্কন ২, অভিধান ১৫, পাঁচালি ও ছড়া ২৩, চিকিৎসা শাস্ত্র ১৮, আইন ও ব্যবহার শাস্ত্র ৪২; ও বিবিধ ৮৬ খানা, তার মধ্যে মুসলমানি বই ৩৮ খানা। লঙ সাহেবের হিসাব অনুযায়ী ১৮৫৭

খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল ৩২২ খানা (আগের অনুচ্ছেদ দেখুন)। বিষয় অনুযায়ী এই ৩২২ খানা বই তিনি এরূপভাবে তালিকাবদ্ধ করেছিলেন—পঞ্জিকা ১৯, ইতিহাস ও জীবনী ১৫, খ্রীষ্টীয় ধর্মপুস্তক ৮, নাটক ৮, শিক্ষা-বিষয়ক ৪৬, আদি-রসাত্মক ১৩, আখ্যান ২৮, আইন ৫, হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যান ৮৫, ধর্ম ও নীতি-কথা ১৯, মুসলমানী বাংলা ২৩, প্রকৃতিবিজ্ঞান ৯, সংবাদপত্র ৬, সাময়িকপত্র ১২, সংস্কৃত-বাংলা ১৪ ও বিবিধ ১২। তাঁর হিসাব অনুযায়ী এই ৩২২ খানা বই ও পত্র-পত্রিকা মোট ছাপা হয়েছিল ৫,৭১,৬৭০ সংখ্যা। সুতরাং বাংলা বইয়ের মুদ্রণ যে খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা বই যে মাত্র এদেশেই ছাপা হচ্ছিল, তা নয়। বিলাতেও বাংলা বই ছাপা হচ্ছিল। বিলাতের অনেকগুলো ছাপাখানাতেই বাংলা হরফ ব্যবহার হতে শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে। এসব হরফের সাট বিলাতেই তৈরি হয়েছিল। বিলাতে অবস্থিত (হার্টফোর্ড ও হেইলিবেরিতে) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলেজে ব্যবহৃত বাংলা বইসমূহ ছাপতো ষ্টিফেন অষ্টিন অ্যাণ্ড সন্‌স্‌ নামক মুদ্রণসংস্থা। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানা বই পরে বিলাতেও ছাপা হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে ছিল রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন', ও চণ্ডীচরণ মুন্‌সির 'তোতা ইতিহাস'। বাংলা মুদ্রণ সম্বন্ধে ষ্টিফেন অষ্টিন ছাড়া, অন্যান্য মুদ্রাকর ছিল কক্‌স্‌ অ্যাণ্ড বেইলিস্‌, উইলিয়াম ক্লাউয়েস্‌, রিচার্ড ওয়ার্ড, জে. এল. কক্‌স্‌ অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রমুখ। এদের মধ্যে জে. এল. কক্‌স্‌ অ্যাণ্ড কোম্পানি ছেপেছিল হাউটনের বিখ্যাত বাংলা-সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান। পিয়ারীচরণ সরকারের 'ফার্ষ্ট বুক অভ্‌ রিডিং'-এর মধ্যেও ছিল বাংলা হরফের ব্যবহার। এটাও বিলাতে ছাপা হত। এ ছাড়া, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রসমূহও ছাপা হত বিলাতে।

নয়

সাহিত্যে চৌর্যবৃত্তি এ যুগেই শুরু হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ অক্টোবর তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছিলেন—"কালী-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ সংপ্রতি 'উপদেশ কৌমুদী' আখ্যা

প্রদান পুরঃসর এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশন করেন। ঐ গ্রন্থে যে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমি স্বল্প সাধ্যদ্বারা, বিশেষ পরিশ্রমে গণপতি, দিনপতি, পশুপতি এবং ভগবদ্‌গুণ বর্ণনা-পূর্বক যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলাম তাহা তেঁহ প্রচ্ছন্নভাবে হরণ করত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বলিয়া স্থানে স্থানে দুই একটা শব্দান্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুধীবর মহাশয়েরা কালীমোহনের আশ্চর্য বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচনা করুন। আমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি। তন্মধ্যে উল্লিখিত কবিতা-কদম্ব নবীন গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অপহৃত হইল। ঐ কবিতার প্রতি আমার বিলক্ষণ স্নেহ আছে। তন্মধ্যে কিয়দংশ পরিবর্ত ও সংযোগ করণের অভিপ্রায়ও রহিয়াছে। অতএব সুপণ্ডিত জনসমূহ পূর্বোক্ত কবিতাসমূহ কালীমোহনের নিজ বিরচিত বোধ করিবেন না। আমি অন্যান্য কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদায় যোগ করিয়া অবিলম্বে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় মুদ্রণ গ্রন্থ প্রকাশে যে চৌর্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক।"

কি উপায় ঈশ্বরচন্দ্র অবলম্বন করেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ অগষ্ট তারিখের এক বিজ্ঞাপনে অন্য এক প্রকাশক অনুরূপ চৌর্যবৃত্তির জন্য আইনের হুমকি দেখিয়েছিলেন। ওই বিজ্ঞাপনে দেবীচরণ পরামাণিক নামে এক ব্যক্তি লিখেছিলেন—"চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরা-মোহন মিত্রকে প্রকাশপত্রের দ্বারা আমরা সম্বাদ দিতেছি যে ১২৩৬ সালের গত ২৪ শ্রাবণ তারিখের 'তিমিরনাশক' নামক সমাচার পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে তিনি 'চন্দ্রকান্ত' নামক পুস্তক কোন ব্যক্তির অনুমত্যানুসারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যোগ করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে জ্ঞাত করাইতেছি যে ঐ পুস্তক আমার-দিগের দ্বারা রচনা হইয়া এবং অর্থব্যয়ের দ্বারা বিক্রয়ার্থ ছাপা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার ৯০০ নয় শত কপি পুস্তক আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে। তাহা বিক্রয় হয় নাই। যদ্যপি তিনি ঐ 'চন্দ্রকান্ত' পুস্তক পুনর্বার ছাপা করেন, তবে আমারদিগের ঐ পুস্তকের ক্ষতির নিশা তাঁহাকে করিতে হইবে এবং একের রচিত গ্রন্থ অন্য ব্যক্তি তাহার অনভিমতে ছাপা করিলে তদ্বিষয়ের যে আইন নিরূপণ

আছে তদনুসারে উচিত ফলপ্রাপ্ত হইবেন।" এ থেকে বোঝা যায় যে গ্রন্থের স্বত্ব রক্ষার জন্য প্রকাশন ক্ষেত্রের প্রথম যুগের লোকেরা বেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল।

দশ

শুধু যে বই ছাপা হচ্ছিল, তা নয়। ছবিও ছাপা হচ্ছিল। প্রথম সচিত্র বই হচ্ছে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল'; এতে শিল্পী রামচাঁদ রায়ের আঁকা ছয়খানা ছবি ছিল। আরও যেসব সচিত্র বই বেরিয়েছিল তার মধ্যে ছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সঙ্গীততরঙ্গ', ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'গৌরীবিলাস', এবং ওই সালেই প্রকাশিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'আনন্দলহরী', 'বত্রিশ সিংহাসন', ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী', ও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হরিমঙ্গলগীত' ও 'অন্নদামঙ্গল'-এর অপর এক সংস্করণ। এই অন্নদামঙ্গলের ছবি এঁকেছিলেন চার জন শিল্পী—বীরচন্দ্র দত্ত, রূপচাঁদ আচার্য, রামধন স্বর্ণকার ও রামসাগর চক্রবর্তী। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মণরাও এই শিল্পে দক্ষতা লাভ করছিল। 'হরিমঙ্গল'-এ আছে রামধন স্বর্ণকারের ৭১ খানা ধাতুখোদাই ছবি। কাঠখোদাই ছবিও নানা বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য কাঠখোদাই ছবি আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। অন্ততঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে তো ছিলই। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দু-একখানা বইয়ে কাঠখোদাই ব্লকের ছবি দেখেছিলেন। আগে যে বইগুলোর নাম করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যেগুলোতে কাঠখোদাই ব্লক ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে 'গৌরীবিলাস' (১৮২৪) ও 'কালীকৈবল্যদায়িনী' (১৮২৬)। এছাড়া নূতন পঞ্জিকা (১২৪২ বঙ্গাব্দ), 'হরপার্বতী মঙ্গল' (১৮৫১), এবং 'অন্নদামঙ্গল'-এর অপর এক সংস্করণ (১৮৫৭) প্রভৃতি বইয়েও কাঠখোদাই ব্লকের ছবি ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মার্চ তারিখের এক বিজ্ঞাপনে দেখি যে জনৈক গ্রাণ্ট সাহেব পারসি ব্যবসায়ী রুস্তমজী কাওয়াসজী, বাংলা গ্রন্থকার তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কলকাতা টাঁকশালের জমাদার রামপ্রসাদ দোবে ও মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন প্রভৃতির প্রতিকৃতি এক পুস্তকে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া আগেই উল্লেখ করা

হয়েছে যে এ সময় ম্যাপ, নকশা, মানচিত্র ও অ্যাটলাস প্রভৃতি ছাপা হয়েছিল। এদিকে বাংলা সাময়িক পত্রিকাতেও ছবি ছাপা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক একখানা বাংলা মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এর প্রত্যেক সংখ্যায় একটা করে জন্তুর বিবরণ ও প্রথম পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর কাঠখোদাই ছবি থাকত। ছবিগুলো আঁকতেন দক্ষ শিল্পী লসন। তিনি শ্রীরামপুরে এক মেয়ে-স্কুলে ছবি আঁকা শেখাতেন।

কাঠখোদাই ছবি বই ও সংবাদপত্রে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত ব্যবহৃত হত। এগুলো তৈরি করবার জন্য একদল দক্ষ শিল্পী ছিল, যাদের আস্তানা ছিল চিৎপুর রোডে নূতন বাজারের সংলগ্ন অঞ্চলে। আজ তাদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে হাফটোন ব্লকের প্রবর্তনের ফলে।

এদেশে হাফটোন ব্লক প্রবর্তনের পথিকৃৎ ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। তিনি বাংলা শিশু-সাহিত্যেরও জনক। চিত্রবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। শিশুদের জন্য লিখিত বইয়ে ছবি ছাপা পদ্ধতির দুর্বলতা লক্ষ্য করে তিনি 'হাফটোন' পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন। পাশ্চাত্ত্য দেশেও হাফটোন পদ্ধতি তখন গবেষণার পর্যায়ে ছিল। সেজন্য উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণা-লব্ধ প্রবন্ধসমূহ বিলাতের পত্রিকাগুলিতে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে প্রকাশিত হত। উপেন্দ্রকিশোর দেশীয় গবেষণায় নানা প্রকার ডায়ফর্ম সৃষ্টি, রে-স্ক্রীন অ্যাডজাষ্টার যন্ত্র নির্মাণ, ডুয়োটাইপ ও রে-টিণ্ট পদ্ধতির উদ্ভাবনে কৃতিত্ব দেখান। তখন থেকেই এদেশে প্রসেস-শিল্প বিকাশের সূত্রপাত হয়। উপেন্দ্রকিশোর সম্বন্ধে মারি সিটন বলেছেন যে তিনি ছিলেন 'Calcutta's outstanding Printer'। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইউ. রায় অ্যাণ্ড সনস্ নামে তিনি তাঁর সংস্থা স্থাপন করেন। তাঁর ছাপাখানার অবস্থান প্রথমে ছিল ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে; তারপর ৭নং শিবনারায়ণ দাস লেনে, তারপর ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে, এবং সব শেষে ১০০ নং গড়পার রোডে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থাটির অবলুপ্তি ঘটে।

উপেন্দ্রকিশোরের পরে ক্ষীরোদবিহারী সাঁই (K. V. Seyne) প্রসেস ব্লকের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখান। প্রথম তিনি মহিলা প্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, পরে লালচাঁদ অ্যাণ্ড সন্সের সঙ্গে। পরে তিনি স্বাধীনভাবেই একটা সংস্থা স্থাপন করেছিলেন।

আজ বই ও সংবাদপত্রে ছবি ছাপার জন্য প্রসেস-ব্লকই ব্যবহৃত হয়। এজন্য বহু সংস্থা স্থাপিত হয়েছে।

এগার

বই ছাপা যেমন এগিয়ে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের দামও কমে যাচ্ছিল। এ বিষয়ে বটতলার প্রকাশকদের অবদানই সবচেয়ে বেশি ছিল। বটতলা বলতে আমরা আপার চিৎপুরে রোডে (বর্তমানে রবীন্দ্র সরণি) ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্কুলের আশেপাশে কতকগুলো প্রকাশকদের বুঝি। এ প্রকাশনা ক্ষেত্রের পথিকৃৎ ছিলেন বিশ্বনাথ দেব। তিনি ১৮১৫-২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর ব্যবসা শুরু করেছিলেন। কিন্তু বটতলার প্রকাশনা বিশেষভাবে অগ্রগতি লাভ করে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর যখন নৃত্যলাল শীল বটতলায় আবির্ভূত হন। বইয়ের দাম কি রকম সস্তা হয়ে গেল, তার একটা বিবরণ দিয়েছেন ড. সুকুমার সেন মহাশয়। তিনি বলেছেন—'বটতলা ছাপাখানার দৌলতে বাংলা বইয়ের দাম অসম্ভাবিত রকমে কমিয়া গিয়াছিল পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে। কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ কাব্যের শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা সংস্করণের মূল্য ছিল চব্বিশ টাকা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা (১৮৫৬) (কোয়ার্টো ৪৯৪ পৃষ্ঠা) সংস্করণ দাম মাত্র দেড় টাকা। কৃত্তিবাসের আদিপর্ব রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেসে ছাপা (১৮৩১) তিন টাকা। সুধাবিন্দু প্রেসে ছাপা (১৮৫৮) দুই আনা মাত্র। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে ছাপা (১৮২৩) ছয় টাকা, কমলালয় প্রেসে ছাপা (১৮৫৬) এক টাকা। কালিদাস কবিরাজের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সমাচারচন্দ্রিকা প্রেসে ছাপা (১৮৩১) দুই টাকা, সুধাসিন্ধু যন্ত্রে (১৮৫৬) ছাপা চারি আনা, 'আদিরস' মথুরানাথ মিত্রের প্রেসে ছাপা (১৮৩১) চারি আনা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা (১৮৫৬) এক পয়সা মাত্র। ১২৩৮ সালের নূতন পঞ্জিকার মূল্য এক টাকা, ১২৬৩ সালের নূতন পঞ্জিকার দাম ছয় পয়সা (অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রেস) ও এক আনা (হরিহর যন্ত্র)। মনে রাখিতে হইবে যে বটতলার বই সর্বদা মুদ্রিত মূল্যের কমে বিক্রয় হইত।" বইয়ের দাম প্রসঙ্গে লঙ সাহেব বলেছেন—"শিশুবোধ বিক্রি হচ্ছে প্রতি ৬০ পৃষ্ঠা এক আনা দরে। বাজে কাগজে ছাপা 'বিদ্যাসুন্দর' আগে (১৮২৫) যেখানে বিক্রি হতো এক টাকায়, তখন

(১৮৫৯) পাওয়া যাচ্ছে দু-আনায়।" এ ছাড়া বটতলা সৃষ্টি করেছিল এক শ্রেণীর নিম্নমানের নূতন সাহিত্য। এগুলোর চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্যকর নামকরণ করা হত, এবং এগুলো এক আনা দু আনা দামে বিক্রি করা হত। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

বস্তুতঃ বটতলার অবদান অনেক। প্রথম, সস্তাদামে বই বিক্রি। দ্বিতীয়, হিন্দু মুসলমান ঐক্য। তৃতীয়, সৎসাহিত্য (যেমন—রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদভাগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান, লক্ষ্মী চরিত্র প্রভৃতি) প্রচার। চতুর্থ, গ্রাম বাঙলায় বই পৌঁছে দেবার জন্য ফিরিওয়ালা। (বটতলা সম্বন্ধে পরে আরও দেখুন)।

বার

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর বাংলা প্রকাশন ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এল। এতদিন লোক পুরানো কালের সাহিত্যের মুদ্রণ ও প্রকাশন নিয়েই বিশেষ ব্যস্ত ছিল। এখন বুদ্ধিজীবী মানুষ এক নূতন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য সৃজনের দিকে মন দিল। বাংলা সাহিত্য নূতন রূপ নিল। উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম হল। প্রথম উপন্যাস লিখলেন এক বিদেশিনী মহিলা হানা কাথারীণ ম্যালেনস্। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। বইটি চলতি ভাষায় লেখা। (কয়েক বছর আগে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এর এক সংস্করণ প্রকাশ করেছেন)। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর') লিখলেন 'আলালের ঘরের দুলাল'। এটাও চলতি ভাষায় লেখা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ কথ্যভাষায় লিখলেন সমাজজীবনের এক স্থূল ব্যঙ্গচিত্র 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'। নাটকেরও সৃষ্টি হল। নাটুকে রামনারায়ণ, মধুসূদন এলেন। পরে দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন 'নীলদর্পণ'। তারপর আবির্ভূত হলেন নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র। তারপর আত্মপ্রকাশ করলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। আরও পরে এলেন তারাশঙ্কর ও হাজার হাজার লেখক। তাঁরা রচনা করলেন উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা প্রভৃতির বই। প্রকাশন ক্ষেত্র উপচে পড়ল বইমুদ্রণের হিড়িকে। (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের একটা তালিকা প্রকাশ করেছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের মেয়ে কুমারী ইন্দিরা

সরকার)। লঙ সাহেব ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪০০ বাংলা বইয়ের তালিকা দিয়েছিলেন। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের তালিকা দেওয়ার কোন উপায় নেই। তবে সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে গত এক শত বৎসর প্রতি সালে সাত-আটশো করে বই ছাপা হয়েছে।

আগেকার দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (এখনকার দিনেও কোন কোন ক্ষেত্রে) গ্রন্থকার নিজের পয়সায় বই ছাপিয়ে অপরকে দিয়ে প্রকাশিত করতেন। বই হয় লেখক নিজে, নয় মুদ্রাকর নিজে বেচত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বইয়ের দোকান নেই বলে লঙ সাহেব আক্ষেপ করেছিলেন। বই বিক্রি করত ফিরিওয়ালারা। বইয়ের স্তূপ মাথায় নিয়ে তারা পথে পথে কিংবা হাটে গঞ্জে ঘুরে বেড়াত। গ্রাম বাঙলায় সাহিত্য প্রচার বটতলার ফিরিওয়ালারাই করেছিল। তাদের কাছে গ্রাম বাঙলার ঋণ অপরিশোধনীয়।

তখনকার দিনে ঝুঁকি নিয়ে বই ছাপাবার মত ব্যবসায়ী-প্রকাশক খুব কম ছিল। যারা ছিল তাদের অনেকে আজ আর নেই, যেমন এস. সি. আঢ্য অ্যাণ্ড কোম্পানি। মাত্র দু-চারটে সংস্থার নাম করা যেতে পারে যেগুলো এখনও বেঁচে আছে। বটতলার নৃত্যলাল শীলের প্রতিষ্ঠান ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়ে এখনও বেঁচে আছে। বটতলায় আরও বেঁচে আছে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ডায়মণ্ড লাইব্রেরি, টাউন লাইব্রেরি, কলিকাতা সুলভ লাইব্রেরি, জেনারেল লাইব্রেরি প্রভৃতি। কলেজ ষ্ট্রীটে পুরানো প্রকাশকদের মধ্যে বেঁচে আছে দেব সাহিত্য কুটীর, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও এস. কে. লাহিড়ী। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়ে গুপ্তপ্রেশ এখনও তাদের পঞ্জিকা বের করে আসছে। তবে তারা অভিধান (হাজার পাতার ইংরেজি-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি অভিধান মাত্র আট আনায় বেচতেন) ও গীতা ছাপানো এখন বন্ধ করে দিয়েছে।

গত বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে অসংখ্য প্রকাশকের আবির্ভাব হয়েছে। ইদানীংকালে তাঁদের অনেকে একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ করেছেন, বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় লেখকদের 'রচনাবলী' সমূহ বের করে।

তের

বই তৈরির ব্যাপারে আর যারা সাহায্য করে, তাদের কথা কিছু বলা যাচ্ছে। কেন না, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে কাগজের পিঠে কালির ছাপ পড়লেই বই প্রকাশ-যোগ্য হয় না। মধ্যে আরও অনেক করণীয় ব্যাপার আছে। তার মধ্যে আছে বই বাঁধাই ও বইয়ের সাজসজ্জার জন্য প্রচ্ছদপট অঙ্কন। আগে বই বাঁধাইয়ের কাজটা মুসলমান দপ্তরিদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। কিন্তু গত ৪০ বছরের মধ্যে অনেক হিন্দু বাঁধাইকারকের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, তারা হচ্ছে এ. বি. রায়, সেঞ্চুরি বাইণ্ডিং, বাসন্তী বাইণ্ডিং প্রভৃতি।

আগে বই বাঁধানোর সমস্ত কাজটাই হাতে হত। এখন অনেক জায়গাতেই মেশিন ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে সেলাই ও ছাঁটাইয়ের জন্য।

দুর্মূল্যতার জন্য এখন আগেকার মত কাপড়ে বা রেক্সিনে বাঁধাই বই খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোর্ডের ওপর কাপড় বা রেক্সিনের বদলে কাগজ ব্যবহার করা হচ্ছে। আগেকার মত চটকদার প্রচ্ছদও এখন ব্যবহৃত হয় না। আজকালকার প্রচ্ছদ শিল্পচাতুর্যের যথেষ্ট চিহ্ন বহন করে। বর্তমানকালের সবচেয়ে বড় প্রচ্ছদ-শিল্পী হচ্ছেন সত্যজিৎ রায়। তিনি অসংখ্য বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে নিজের শিল্পস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। আর যাঁরা প্রচ্ছদ অঙ্কনে নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন খালেদ চৌধুরী ও পূর্ণেন্দু পত্রী।

সকলের শেষে প্রকাশকদের বর্তমান সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই। বর্তমানে তাঁদের সমস্যা হচ্ছে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ, কাগজ ও মুদ্রণের অসম্ভব ব্যয় বৃদ্ধি, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার দরুন বই প্রকাশনে দেরি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের হারবৃদ্ধির জন্য বইয়ের যথাযথ প্রচার করবার অক্ষমতা, কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি, মফঃস্বলে বই পাঠানোর ডাকমাশুল ও রেলভাড়া বৃদ্ধি ও বইয়ের দুর্মূল্যতার জন্য বইয়ের কাটতি হ্রাস।

ভাত-ডালের মত বই-ও এখন বাঙালির কাছে একটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বইয়ের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে সব বইয়ের খবর রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়েছে। সেজন্য প্রকাশকরা

সম্প্রতি একটা নূতন উদ্যোগ করেছেন। গত তিন বছর যাবত তাঁরা একটা বইমেলা করছেন। সেখানে সাধারণ পাঠকের পক্ষে নতুন বই নিজে দেখে পছন্দ করে কেনবার একটা সুযোগ মিলেছে। এতে শহরের ও শহরতলীর পাঠকরা উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে ইদানীংকালে ডাকমাশুল-হার বেড়ে যাওয়ার জন্য বই কেনা খুব দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য প্রকাশকরা যদি মফঃস্বলেও (বিশেষ করে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে) অনুরূপ বইমেলা অনুষ্ঠিত করেন তো খুব ভাল হয়। বই বিক্রির অবশ্য আর একটা উপায় আছে। সেটা বিজ্ঞাপন দ্বারা। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞাপনের ব্যয় এত বেড়ে গেছে যে সব প্রকাশকদের পক্ষে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ নেবার সুবিধা হয় না।

বাংলা বইয়ের সংগ্রহ

এদেশে এমন কোন গ্রন্থাগার নেই যেখানে আজ পর্যন্ত যত বাংলা বই বেরিয়েছে সব দেখতে পাওয়া যাবে। বিশেষ করে পুরানো ছাপা বই এদেশে খুব কমই সংগৃহীত আছে। কেন না গোড়ার দিকে ছাপা বই রক্ষণশীল সমাজের কাছে অপাংক্তেয় ছিল। খ্রীষ্টানরা এই সব বই ছাপতো বলে সনাতনীরা সেগুলো ঘরে তুলতো না। এমন কি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দেও আমরা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজ্ঞাপন দিতে দেখি যে তিনি ব্রাহ্মণ দ্বারা তুলাট কাগজে শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক সংস্করণ মুদ্রাঙ্কিত করছেন। কলকাতার বাবুসমাজের কাছেও সাধারণ বই অনাদৃত ছিল। তাদের প্রবণতা ছিল আদিরসাত্মক বইয়ের দিকে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎকালীন বাবু সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করে রেখে গেছেন, তার সঙ্গে এটা খুবই খাপ খায়।

এদেশে সংরক্ষিত না হলেও পুরানো ছাপা বাংলা বইয়ের সংগ্রহ বিলাতে তিন জায়গায় গড়ে উঠেছে। ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি, ও স্কুল অভ্‌ ওরিয়েণ্ট্যাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজের লাইব্রেরি। ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরি গড়ে উঠেছিল ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকরা অবসর গ্রহণের পর যখন বিলাতে ফিরে যেতেন, তখন তাঁরা তাঁদের বইসমূহ এই সংস্থাকে দিতেন। প্রথমে এটা অবস্থিত ছিল লেডেনহল ষ্ট্রীটে। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ভারতের শাসনভার নেবার পর এটা চলে যায় হোয়াইট হলে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অভ্‌ বুকস অ্যাক্ট্ পাশ হবার পর কপিরাইট-নিয়ম অনুযায়ী ছাপা বই সরকারের কাছে জমা দেবার পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। প্রাপ্ত বইসমূহ বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি ও ভারতে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিতে (ইম্পিরিয়াল, পরে ন্যাশনাল লাইব্রেরির অগ্রগামী) রাখা হত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের সনদ দ্বারা স্কুল অভ্‌ ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজকে স্বীকৃতি দেবার পর তাঁরাও বাংলা বই সংগ্রহে বিশেষ তৎপর হন।

বিলাত ছাড়া, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জারমানিতেও বিশেষ যত্নের সঙ্গে বাংলা বই সংগৃহীত হয়। আমি শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনেছি (পরে সুনীতি বাবু ঘটনাটা নিজেই বিবৃত করেছিলেন) যে একবার আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন আমেরিকায় যান, তখন এক বাঙালি পরিবার তাঁকে এক বিবাহে (অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের মেয়ের বিবাহ) পৌরোহিত্য করতে বলেন। বিবাহের মন্ত্রের জন্য তাঁর সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'পুরোহিতদর্পণ' বইখানার প্রয়োজন হয়। এক আমেরিকান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে যাওয়া মাত্র তিনি মুহূর্তের মধ্যে বইখানা পান। অনুরূপ ভাবে ওই বই এদেশের একজনের প্রয়োজন হওয়ায় তাঁকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাঁচ দিন ধরনা দিতে হয়েছিল।

কলকাতার পুরানো লাইব্রেরিসমূহ যেখানে পুরানো বই পাবার সম্ভাবনা ছিল, যত্নের অভাবে সেগুলি আর সেখানে নেই। এ রকম লাইব্রেরির মধ্যে নাম করা যেতে পারে চৈতন্য লাইব্রেরি, রামমোহন লাইব্রেরি, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি, আহিরিটোলা রিডিং রুম, বাগবাজারের বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি ও শিশিরকুমার ইনস্টিট্যুট। কিছু বই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে। শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেও কিছু দুষ্প্রাপ্য বাংলা বই আছে।

কলকাতার বাইরে কিছু পুরানো বই আছে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, শ্রীরামপুর কেরি লাইব্রেরি ও হুগলি কলেজ লাইব্রেরিতে।

ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পর কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা অনেকেই বই সংগ্রহ করতেন। তাঁদের মধ্যে নাম উল্লেখ করা যেতে পারে রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন নিয়োগী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ। কথিত আছে যে বাগবাজারের কৃষ্ণমোহন নিয়োগীর লাইব্রেরি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি অপেক্ষাও ভাল ছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি গঠনের সময় তিনি তাঁর গ্রন্থাগার ওই সংস্থাকে দান করেন। ব্যক্তিগত বৃহত্তম গ্রন্থাগার ছিল মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের। ওটা বিক্রি হয়ে যায়। এদেশের কোন প্রতিষ্ঠান না কেনায়, আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয় ওটা কিনে নিয়ে যায়।

বাংলা সাময়িক পত্র

এক

বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দটা ছিল একটা বিশেষভাবে চিহ্নিত বৎসর। এখানে পটভূমিকাটা একটু বলে নেওয়া দরকার। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজি সংবাদ পত্র হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'-এর আবির্ভাব হয়। তাতে ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর স্ত্রীর নামে নানারকম কুৎসা রটানো হত। তারপর 'বেঙ্গল জর্নাল' নামে আর একখানা কাগজ বেরোয়। এটাতে এরূপ অভদ্র ভাষা ব্যবহার করা হত যে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এর সম্পাদক উইলিয়াম ডুয়েনকে ধরে বন্দী করে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সময় ইংরেজদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। সেই কারণে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ইংরেজি সংবাদপত্র পরীক্ষার রীতি (censorship) প্রবর্তন করেন। এই বিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রবন্ধ গভর্ণমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারীকে দেখিয়ে ছাপাতে হত। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নিয়মকে আরও কঠিন করা হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস এই নিয়ম একপ্রকার রহিত করেন। এর ফলস্বরূপ নতুন নতুন কাগজ দেখা দেয়। এ বৎসরই প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা সংবাদপত্র। সেখানা শ্রীরামপুর মিশন থেকে জোশুয়া মার্শম্যান কর্তৃক সম্পাদিত 'সমাচারদর্পণ', কি কলকাতা থেকে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেট' সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। দু'খানা কাগজই একই সময়ে কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে 'সমাচার দর্পণ'-ই আগে বেরিয়েছিল বলে মনে হয়। তবুও গঙ্গাকিশোরের কাগজখানাই প্রথম বাঙ্গালি-সম্পাদিত কাগজ হিসাবে সম্মানের পাত্র। দুখানা কাগজই সাপ্তাহিক কাগজ। তবে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি থেকে 'সমাচারদর্পণ' সপ্তাহে দুবার বেরুতে শুরু করেছিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই হতে 'সমাচারদর্পণ' সম্পাদক মার্শম্যানের ওপর 'গভর্নমেণ্ট গেজেট' নামে অন্য একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন ভার পড়ায়, তিনি কাজের চাপে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর থেকে 'সমাচারদর্পণ'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন। পরের বছর বাঙালিদের চেষ্টায় ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের

সম্পাদনায় 'সমাচারদর্পণ' আবার প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু পরের বছরেই কাগজখানার প্রকাশ আবার বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন 'সমাচারদর্পণ' পুনরায় প্রকাশ করে, কিন্তু দেড় বৎসর পরে কাগজখানার একেবারেই বিলুপ্তি ঘটে।

গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশি দিন চলে নি। বছর খানেক বাদেই ওটা বন্ধ হয়ে যায়। গঙ্গাকিশোরের কাগজ উঠে যাবার পর হিন্দুরা একখানা নিজেদের সংবাদপত্রের অভাব অনুভব করে। এই অভাব দূরীকরণের জন্য ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর থেকে ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সম্বাদকৌমুদী' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুতে আরম্ভ করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকে 'সম্বাদকৌমুদী' সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কাগজখানা উঠে যায়।

'সম্বাদকৌমুদী' পত্রে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়কে আন্দোলন করতে দেখে, রক্ষণশীল হিন্দুরা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মার্চ তারিখ থেকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে অপর একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতে শুরু করেছিল। এর সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এজন্য তিনি 'সম্বাদকৌমুদী'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সপ্তাহে দুবার করে বেরুতে থাকে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র হিসাবে 'সমাচারচন্দ্রিকা' সমাজে বেশ প্রাধান্য লাভ করেছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন এর সম্পাদনা করেছিলেন। যতদূর জানা আছে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পর কাগজখানার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও দুখানা সংবাদপত্র বেরোয়। প্রথমখানা হচ্ছে 'সম্বাদ তিমিরনাশক'। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে এর জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এটা সপ্তাহে দুবার করে প্রকাশিত হত। এটাও রক্ষণশীল সমাজের কাগজ ছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এর প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আর একখানা কাগজ হচ্ছে নীলরত্ন হালদার-সম্পাদিত 'বঙ্গদূত'। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এর জন্ম, এবং কয়েক বৎসর এ কাগজখানা চালু ছিল।

দেখা যাচ্ছে যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে মাত্র পাঁচখানা সংবাদপত্র ছিল।

কিন্তু এর পর সংবাদপত্রের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। তা ছাড়া ১৮৩০-এর দশকেই প্রথম দুখানা বাংলা দৈনিক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। একখানা হচ্ছে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'সংবাদ প্রভাকর'। অবশ্য, সাপ্তাহিক হিসাবেই এর জীবনযাত্রা শুরু হয়, কিন্তু ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সপ্তাহে তিনবার ও ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দৈনিক পত্রিকা হিসাবে বেরুতে শুরু করে। ওই সালেরই ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত হয় অপর দৈনিক পত্রিকা জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সম্বাদ অরুণোদয়'। এর পরের দৈনিক পত্রিকা হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত একখানা কাগজ, নাম 'মহাজন-দর্পণ', সম্পাদক জয়কালী বসু, প্রকাশ কাল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। এরও পরের দৈনিক পত্রিকা হচ্ছে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পরিদর্শক'। কিন্তু অনাদর হেতু দৈনিক পত্রিকাগুলি অল্প কালের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যায়। এ পরিস্থিতি বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে দু'খানি দৈনিক পত্রিকা ছিল 'দৈনিক চন্দ্রিকা' ও 'নায়ক'। এদের আয়ুষ্কাল খুব বেশিদিন ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 'হিন্দুস্থান' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা বেরিয়েছিল, কিন্তু সেও বেশি দিন জীবিত ছিল না। বাংলা দৈনিক পত্রিকাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করেছে 'বসুমতী' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা।'

দুই

গোড়া থেকে আরও যে সব সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিক্যর আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। যথা 'ব্রাহ্মণসবধি' (দ্বিভাষিক ১৮২১), 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (দ্বিভাষিক ১৮৪২), 'জ্ঞানান্বেষণ' সাপ্তাহিক (১৮৩১), 'সংবাদ রসরাজ' (১৮৩৯), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৬৩), 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪), 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫), 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), 'এডুকেশন গেজেট' ও সাপ্তাহিক 'বার্তাবহ' (১৮৫৬,), বঙ্গদর্শন, (১৮৭২), 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১২৭৪),'সাধারণী (১২৮০ বঙ্গাব্দ), 'মাসিক ভ্রমর' (১২৮১ বঙ্গাব্দ), 'নবজীবন' (১২৯১বঙ্গাব্দ), 'বান্ধব' (মাসিক ১২৮১ বঙ্গাব্দ), 'ভারতী' (মাসিক ১৮৮৪ বঙ্গাব্দ)

'বঙ্গবাসী' (সাপ্তাহিক ও দৈনিক ১২৮৮ বঙ্গাব্দ), 'সঞ্জীবনী' (সাপ্তাহিক ১২৯০ বঙ্গাব্দ), 'নব্যভারত' (মাসিক ১২৯০ বঙ্গাব্দ), 'সাহিত্য' (মাসিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ), 'হিতবাদী' (সাপ্তাহিক ১২৯৮ বঙ্গাব্দ), 'সাধনা' (মাসিক ১২৯৮ বঙ্গাব্দ', 'দাসী' (মাসিক ১২৯১ বঙ্গাব্দ), 'বসুমতী' (সাপ্তাহিক ১৩০৩, দৈনিক ১৩২১ ও মাসিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'উদ্বোধন' (১৩০৫ বঙ্গাব্দ), 'প্রবাসী' (মাসিক ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। 'ভাণ্ডার' (মাসিক ১৩১২ বঙ্গাব্দ), 'স্বরাজ' (সাপ্তাহিক ১৩১৩ বঙ্গাব্দ), 'ভারতবর্ষ (মাসিক ১৩২০ বঙ্গাব্দ), 'নারায়ণ' (মাসিক ১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'সবুজপত্র' (মাসিক ১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'মানসী' (মাসিক ১৩১৫ বঙ্গাব্দ), 'মর্মবাণী' (মাসিক ১৩২২ বঙ্গাব্দ), 'মানসী ও মর্মবাণী' (মাসিক ১৩২২ বঙ্গাব্দ), 'বিজলী' (সাপ্তাহিক ১৩২৭ বঙ্গাব্দ), 'বাংলার কথা' (সাপ্তাহিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'বঙ্গবাণী' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'ধূমকেতু' (পাক্ষিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'কল্লোল' (মাসিক ১৩৩০ বঙ্গাব্দ), 'শনিবারের চিঠি' (১৩৩১), 'বিচিত্রা' (মাসিক ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), 'কালিকলম' (মাসিক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), 'পরিচয়' (ত্রৈমাসিক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), 'দেশ' (সাপ্তাহিক ১৩৪০ বঙ্গাব্দ), 'যুগান্তর' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), 'অমৃত' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)। এ তালিকা দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে এদের মধ্যে অধিকাংশই গতায়ু হয়েছে। মাত্র কয়েক খানা বেঁচে আছে। এর পর পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে, যে তাদের সকলের নাম দেওয়া এখানে অসম্ভব।

বইপাড়া কলেজ স্ট্রীট

বইপাড়া বলতে কলেজ স্ট্রীটকে বোঝায়। কলেজ স্ট্রীট যে সত্যিকারের বইপাড়া সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খাস কলেজ স্ট্রীটের বড় রাস্তা ছাড়া, তার অলি-গলিতে, ফুটপাতের ওপরে ও কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ভিতর—সর্বত্রই বইয়ের দোকান। আমি জানি না, আর কোন শহরে এরকম জমাটভাবে একই জায়গায় এত বইয়ের দোকান আছে কি না।

কলেজ স্ট্রীটের বর্তমান বইয়ের দোকানের সমাবেশ দেখে মনে হবে যে বাংলা মুদ্রণের গোড়া থেকেই বুঝি কলেজ স্ট্রীট গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তা ওঠে নি।

যখন শ্রীরামপুর ও কলকাতা থেকে মুদ্রিত বাংলা বই বেরুতে লাগল, তখন সেসব বই হয় মুদ্রাকরের কাছে, আর তা নয় তো লেখকের নিবাসে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে পাওয়া যেত।

কলকাতার প্রথম পুস্তক বিক্রেতা হিসাবে যিনি দাবি রাখতে পারেন, তিনি হচ্ছেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। প্রথমে তিনি ছিলেন বইওয়ালা, তারপর প্রকাশক। গঙ্গাকিশোরের পর বইওয়ালা হিসাবে, আমরা প্রথম নাম শুনি শোভাবাজার রাজবাটির বিশ্বনাথ দেবের। ইনিই বটতলার বইয়ের স্রষ্টা। তাঁর পরের বইওয়ালা হচ্ছেন ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলুটোলায় তাঁর চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে তৎকালীন মুদ্রিত বহু বাংলা বই পাওয়া যেত। এখনকার মতো বইয়ের দোকান তখন কলকাতায় ছিল না। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে লঙ সাহেব আক্ষেপ করে বলেছেন যে কলকাতায় বইয়ের দোকান নেই, আছে বইয়ের ফিরি-ওয়ালা। তারা স্তূপাকার বই মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যেত বই বেচার জন্য।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত যন্ত্রালয় স্থাপনের পর বিদ্যাসাগর মশায় একটা বইয়ের দোকান খুলেছিলেন। দোকানের নাম ছিল সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি। তাঁর যন্ত্রালয় ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলে, আর বইয়ের দোকানটা ছিল আরপুলি লেনের কাছে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলুটোলায় প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবাসী কার্যালয়। এঁরা কবিকঙ্কণ চণ্ডী, হিন্দুপুরাণ সমূহ, মহাভারত ইত্যাদি মুদ্রিত করে সস্তাদামে বেচতেন। কিছু

ইংরেজি বইয়েরও এরা পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন—যথা, ষ্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস, টডের রাজস্থান, মেডোজ টেলরের ঠগের আত্মকাহিনী ইত্যাদি। পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলুটোলায় হিতবাদী কার্যালয় স্থাপিত হলে তারাও কতকগুলো উল্লেখযোগ্য বই ছাপিয়ে বেচতে লাগল—যথা বত্রিশ সিংহাসন, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', ভুতের গল্প ইত্যাদি। হিতবাদীর প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে আছে এই কারণে যে এরাই প্রথম 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' ছাপিয়ে বিনা পয়সায় গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। পরবর্তী কালে সৎসাহিত্য-প্রচারে বঙ্গবাসী ও বসুমতীর অবদানও ছিল প্রশংসনীয়।

যদিও আরপুলি লেন ও কলুটোলা কলেজ স্ট্রীটের সন্নিহিত স্থান, তথাপি খাস কলেজ স্ট্রীটে তখনও বইয়ের দোকান খোলা হয় নি। কলেজ স্ট্রীটে প্রথম বইয়ের দোকান খোলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রথম হিন্দু হোস্টেলের সিঁড়ির কোণে দুর্গাদাস করের 'মেটেরিয়া মেডিকা' বেচতেন। তারপর তিনি কলেজ স্ট্রীটে 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি' স্থাপন করে ডাক্তারি বই বেচা শুরু করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর কলেজ স্ট্রীটের দোকান তুলে নিয়ে আসেন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। তাঁর দোকানের সন্নিকটেই ছিল বি. ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানির দোকান। ওটা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস কলেজ স্ট্রীট থেকে চলে আসবার দুবছর আগে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকুমার লাহিড়ী 'এস. কে. লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানি' নামে তাঁর বইয়ের দোকান খোলেন। তার পরের বছরে (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) কলেজ স্ট্রীটে আর একখানা বইয়ের দোকান হয় 'দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি'র। এই সময়েই ৯৭ নং কলেজ স্ট্রীটে স্থাপিত হয়েছিল 'সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি'। উনবিংশ শতাব্দীতে কলেজ স্ট্রীটে আর কোন বইয়ের দোকান ছিল কি না জানি না। থাকলেও থাকতে পারে। তবে আজ তারা সব লুপ্ত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে, আমরা কলেজ স্ট্রীটে আরও দুখানা বইয়ের দোকান দেখি। আলবার্ট হলের (আজ যেখানে কফি হাউস) পুরানো বাড়ির নীচে কলেজ স্ট্রীটের দিকে দু'খানা বইয়ের দোকান ছিল। একখানা চক্রবর্তী চ্যাটার্জির ও আর একখানা আর. ক্যামব্রে অ্যাণ্ড কোম্পানির। আর. ক্যামব্রে এখন স্থানান্তরিত; আর চক্রবর্তী চ্যাটার্জি সম্প্রতি হাত বদল হয়েছে, তবে

নামটা বজায় আছে। এছাড়া ছিল প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরি ও নিউবেঙ্গল প্রেস। কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে Y. M. C. A. বিল্ডিং-এর তলায় এম, সি. সরকার অ্যাণ্ড সনসেরও দোকান ছিল।

কলেজ ষ্ট্রীটের বাইরেও কতকগুলো বইয়ের দোকান ছিল। গুরুদাসের বর্তমান দোকানের একখানা বাড়ি দক্ষিণে একটা বইয়ের দোকান ছিল। খুব ছোট্ট দোকান, কিন্তু কারবার ছিল খুব জমজমাটে। কেন না উত্তর কলকাতা থেকে স্কুল-কলেজের বই কিনতে এলে এটাই পড়ত প্রথম দোকান। নাম ছিল মনো-মোহন লাইব্রেরি। এর বিপরীত দিকে ছিল মণ্ডল ব্রাদারস্, এস. সি. মজুমদার ও বি. ব্যানার্জির বইয়ের দোকান। আরও দক্ষিণে গেলে শিবনারায়ণ দাস লেনের মোড়ে ছিল বিদ্যাসাগর মশায়ের সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরির রিসিভার সিদ্ধেশ্বর পাইনের দোকান। পরে ঝামাপুকুরের বই-বিক্রেতা আশুতোষ দেবের ছেলে প্রবোধচন্দ্র মজুমদার রিসিভার নিযুক্ত হলে, সিদ্ধেশ্বর পাইনের দোকান উঠে যায়।

এই দোকানগুলো ছাড়া, কলেজ ষ্ট্রীটের বাইরে আর যেসব জায়গায় বইয়ের দোকান কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল আপার চিৎপুর রোড (বটতলা) ও চীনাবাজার। আর একখানা বইয়ের দোকান ছিল কলেজ ষ্ট্রীটের অনেক দক্ষিণে, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে। এখানা ছিল এস. সি. আড্ডি অ্যাণ্ড কোম্পানির দোকান। দোকানখানা ছিল বেশ বড়।

আর বইয়ের দোকান ছিল লালবাজারের মুখে ইণ্ডিয়ান স্কুল সাপ্লাই ডিপোর দোকান। এরা ছিল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উত্তরাধিকারী। পরে এটা ম্যাকমিলান কোম্পানি কিনে নেয়। কিছুদিন চালাবার পর তারা এটা তুলে দেয়।

চীনাবাজারে দোকান ছিল স্বর কোম্পানির, নাথ ব্রাদার্সের ও ক্যানিং লাইব্রেরির। স্বর কোম্পানির দোকান এখনও আছে, এবং এরাই বের করে স্বরস্ ডায়েরি। অনেক কাল ধরে হগ মার্কেটেও অনেকগুলো বইয়ের দোকান আছে।

সাহেব পাড়ায় বইয়ের দোকান ছিল এসপ্লানেডে থ্যাকার স্পিনক্ অ্যাণ্ড কোম্পানি, লালদিঘির সামনে ডবলিউ. নিউম্যান অ্যাণ্ড কোম্পানি ও হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে বাটারওয়ার্থ অ্যাণ্ড কোম্পানি। ডবলিউ. নিউম্যানের দোকানটা ছিল একটা

অতি প্রাচীন বাড়িতে। সেখানা ভেঙেই ষ্টিফেন হাউস তৈরি হয়েছিল। তখন নিউম্যান গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের কোণে যায়।

আবার কলেজ স্ট্রীটেই ফিরে আসা যাক। আলবার্ট হল ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি হবার পর, ওর কলেজ স্ট্রীটের দিকে নীচের তলার ঘরগুলো সবই বই-ওয়ালারা ভাড়া নিল। প্রথমেই দখল করল চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি মাঝখানের ঘরটা। তার উত্তর পাশের ঘরে উঠে এল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের মোড় থেকে কমলা বুক ডিপো। আর দক্ষিণের ঘরে এল ১নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে সেন রায় অ্যাণ্ড কোম্পানি। সেন রায়ের পাশের ঘরে এল ইউ. এন. ধর। উত্তর দিকের শেষ ঘরটায় স্থান করে নিল একটা নতুন বইয়ের দোকান—সেন ব্রাদার্স। এর মালিক ভোলানাথ সেন প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন কলেজ স্ট্রীটের পুস্তকবিক্রেতাদের মধ্যে একমাত্র শহীদ হিসাবে। অত্যন্ত অমায়িক ও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন ভোলানাথ সেন। তাঁর প্রকাশিত একখানা বইয়ে হজরত মহম্মদের নামে এমন কিছু লেখা ছিল যাতে ক্ষিপ্ত হয়ে এক মুসলমান যুবক তাঁকে খুন করল তাঁর দোকানে, ছুরিকাঘাতে।

মোট কথা, আলবার্ট হলের নতুন বাড়িটা হবার পর পাশাপাশি অনেকগুলো বইয়ের দোকান হল। পাশের গলিতে মডার্ন বুক এজেন্সি প্রভৃতি বইয়ের দোকানও স্থাপিত হল। মূল কলেজ স্ট্রীটে দাশগুপ্ত কোম্পানির পাশেও অনেক-গুলো বইয়ের দোকান হল। এস. কে. লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানি তাদের পুরানো বাড়ি ছেড়ে এখানে উঠে এল। কলেজ স্ট্রীট এখন রীতিমত বইপাড়া বলে মনে হল। একখানা ভাল বইয়ের দোকান খুললেন গিরিন মিত্র কলেজ স্কোয়ারের পূর্বদিকে। দোকানের নাম 'বুক কোম্পানি'। এটা ছিল কলকাতার প্রখ্যাত বিদ্বজ্জনের আড্ডা। খুব সবলভাবে বিশ বছরের উপর চালু থাকবার পর দোকানটা পঙ্গু হয়ে গেল। বুক কোম্পানির জায়গায় এখন দোকান হল 'মনীষা'। রবীন্দ্রনাথের বই বেচবার জন্য স্থাপিত হল বিশ্বভারতীর দোকান। আরও স্থাপিত হল ওখানে বি. সরকার অ্যাণ্ড কোম্পানি, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি প্রভৃতি।

সংক্রামক ব্যাধির মতো কলেজ স্ট্রীটে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বইয়ের দোকান চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকে। অগণিত বইয়ের দোকান গজিয়ে উঠল

কলেজ ষ্ট্রীটের বড় রাস্তা ও তার আশপাশের অলিগলির ভিতর। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ভিতরও অনেকগুলো বইয়ের দোকান হল। তার পরের দুই দশকে কলেজ ষ্ট্রীট বিশাল আকার ধারণ করল। তারপর জায়গার অভাবে ফুটপাতের ওপরও বইয়ের দোকান হল। দশ-পনেরো বছরের মধ্যে কলেজ ষ্ট্রীটে বইয়ের দোকান পাঁচগুণ বেড়ে গেল।

বইপাড়া হিসাবে কলেজ ষ্ট্রীটের আর একটা ভূমিকা আছে। সেটা হচ্ছে পুরানো বইয়ের দোকান। আগে নতুন বইয়ের দোকানের তুলনায় পুরানো বইয়ের দোকানই বেশি ছিল। শ্রীমানী মার্কেট থেকে আরম্ভ করে হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত চালাঘরসমূহে ছিল বইয়ের ও চটিজুতার দোকান। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট তৈরি হবার পর তাদের অবলুপ্তি ঘটল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এর ধারে পুরানো বইওয়ালারা প্রায় একশ বছর ধরে অব্যাহত-ভাবে ব্যবসা করে আসছে। আগে ওখানে ফুটপাতের ওপরও ঢেলে বই বিক্রি করা হত। এখন অসংখ্য লোক এখানে ও সন্নিকটে বইয়ের কারবার করে অন্নসংস্থান করছে।

এখানে দুজন নামজাদা পুরানো বইওয়ালার উল্লেখ করি। এরা হচ্ছে নিয়ামুদ্দিন ও ইউসুফ। দুজনেই দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ব্যবসা করত। দুজনেই মারা গিয়েছে। নিয়ামুদ্দিনের কারবার অনেক কাল আগেই উঠে গেছে; ইউসুফের কারবার এখনও আছে।

সবশেষে কলেজ ষ্ট্রীটের একজন বইওয়ালার রোমাঞ্চকর উত্থানের কথা বলি। তিনি হচ্ছেন রূপা কোম্পানির মালিক। গেঞ্জি-মোজার কারবার ছেড়ে দিয়ে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইনি হ্যারিসন রোড দিয়ে শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটে ঢুকতে ডান দিকে যে পুরানো বাড়িটা আছে, তারই দোতলার একটা ঘরে 'পেঙ্গুইন' ও 'পেলিক্যান' বেচতে শুরু করেন। এঁরা এখনও পেঙ্গুইন ও পেলিক্যানের এজেণ্ট। কিন্তু তাঁদের সেই সামান্য দোকান এখন পরিণত হয়েছে এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে। এখন এঁদের দোকান কফি হাউসের বাড়িতে। এঁরা হরেক রকম বই বিদেশ থেকে আমদানি করেন এবং পাইকারি দরে তা কলেজ ষ্ট্রীটের অন্যান্য পুস্তক-বিক্রেতাদের বেচেন।

পরিশিষ্ট ক

বিশিষ্ট লেখক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকগণের পরিচয়

(১৭৭৮-১৯০০)

অক্ষয়কুমার কর্মকার—১০০ বছর আগে ইনি রুদ্র টাইপ ফাউণ্ডারির সাটের ছেনি কেটেছিলেন। তিনি পঞ্চানন কর্মকারের পরিবারেরই লোক ছিলেন।

অধরচন্দ্র কর্মকার—পঞ্চানন কর্মকারের বংশের লোক। তিনি কলকাতায় অধর টাইপ ফাউণ্ডারি স্থাপন করেন। অধর টাইপ ফাউণ্ডারির হরফগুলির সাট সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত অধর টাইপ ফাউণ্ডারি চালু ছিল।

আশুতোষ দেব (১৮৬৭-১৯৪৩)—ইংরেজি ও বাংলা অভিধান এবং অর্থপুস্তকাদি রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দেব সাহিত্য কুটির, এ. টি. দেব লিমিটেড, পি. সি. মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, বরদা টাইপ ফাউণ্ডারি, দেব লাইব্রেরি প্রভৃতি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)—বাঙলার যুগসন্ধির কবি বলে পরিচিত। সাধারণ মানুষের ভাষায় কাব্যরচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত। সংবাদপ্রভাকর, পাষণ্ডপীড়ন, সংবাদরত্নাবলী, সাধুরঞ্জন প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)—তিনি বাংলা হরফের মান স্থির করেন। শিক্ষার জন্য বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যেমন 'বোধোদয়', 'বর্ণ পরিচয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী'। বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি রচনায় তিনি সাহিত্যের দিক নির্দেশ করেন। সরস ও বিদ্রূপাত্মক নিবন্ধ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি একখানা বাঙলার ইতিহাসও রচনা করেছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত তিনি সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই কারণে তাঁর ৬০০ টাকা ঋণ হয়। মার্শাল সাহেবের

পরামর্শ অনুসারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য 'অন্নদামঙ্গল'-এর একটা সুন্দর সংস্করণ ছেপে এই ঋণ পরিশোধ করেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)—শিশু সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পী। নিজ গবেষণার দ্বারা বাঙলায় হাফটোন প্রসেস ব্লকের প্রবর্তক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইউ. রায় এ্যাণ্ড সন্স কোম্পানি' থেকেই ভারতবর্ষে প্রসেস-শিল্প বিকাশের সূত্রপাত হয়।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯১৯)—'বসুমতী' পত্রিকা ও 'বসুমতী সাহিত্যমন্দির'-এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন।

উমানন্দন ঠাকুর—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক। হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য পাষণ্ডপীড়নাদি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করে, নিজের পয়সায় ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় কিছু টাকা দান করেছিলেন ও স্কুল বুক সোসাইটির সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

উইলকিন্‌স্, চার্লস—ভিতরে .০ পৃষ্ঠা দেখুন।

উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩)—কেরি, মার্শম্যান ও তাঁর সমবেত চেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হলে, তিনি মিশন প্রেসের ভার নেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসবার পূর্বে বিলাতে মুদ্রণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)—আক্ষরিক অর্থে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই করেছেন। ইংলণ্ডের নর্দামটনশায়ারে তাঁর জন্ম। পিতা তন্তুবায় ছিলেন। ১২ বছর বয়স থেকে জীবিকার্জনের জন্য নানাস্থানে ঘুরতে থাকেন। এর মধ্যে জুতা সেলাইয়ের কাজও করেছেন। তারই মধ্যে ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ কাহিনী ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করেন। বিশ বছর বয়সে বিয়ে করবার পর তিনি ধর্মযাজক বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য সস্ত্রীক ভারতে আসেন। এখানে রামরাম বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি তাঁকে তাঁর মুনসি নিযুক্ত করেন। তার কাছেই তিনি বাংলা ভাষা শেখেন ও বাইবেল অনুবাদে রত হন। নানা অঞ্চল ঘুরবার পর ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উডনি সাহেবের মালদহের মদনবাটী

নীলকুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এখানে তিনি নিজের কাজের সুবিধার জন্য একখানি শব্দকোষ ও ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশী হরফ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হলে উডনি তাঁকে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে দেন। মদনবাটীর কুঠি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি খিদিরপুরে এসে বসবাস করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান, ওয়ার্ড, গ্রাণ্ট প্রভৃতি কয়েকজন মিশনারি এদেশে এলে, তাঁদের সঙ্গে তিনি শ্রীরামপুরে আসেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপন করেন। এই বছরের মার্চ মাসেই পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যোগ দেন। তাঁদের মিলিত চেষ্টায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় 'মথীরচিত মিশন সমাচার' বইটি মুদ্রিত হয়। এটাই বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম গদ্য পুস্তক। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে তাঁর সহকারীদের দ্বারা বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনা করাতে থাকেন। রামরাম বসু লেখেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লেখেন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'। এই সব গ্রন্থ শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কেরি নিজেও প্রায় ৫০টি বই লেখেন। তার মধ্যে আছে 'ইতিহাসমালা', 'বাংলা-ইংরেজি অভিধান', 'বাংলা ব্যাকরণ' ইত্যাদি। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহনিবারক আইন অনুবাদ করেন। তিনি বাংলা হরফের সংস্কার ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফ তৈরি করান।

উইলিয়াম হাণ্টার—১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'হিন্দুস্থানী প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

উইলিয়াম জোন্স্ (১৭৪৬-১৭৯৪)—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন। তার মধ্যে শকুন্তলা, হিতোপদেশ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ উল্লেখনীয়। বাংলা অক্ষরে 'ঋতুসংহার' (১৭৯২) ছাপিয়েছিলেন।

এ. (অ্যারন) আপজন—১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালী বোকেবিলরি'

নামে একখানা শব্দকোষ ও ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার 'ম্যাপ' ছাপিয়ে ছিলেন।

এনড্রুজ—হুগলির বিশিষ্ট মুদ্রাকর ও পুস্তকবিক্রেতা। হ্যালহেডের 'গ্রামার' ছেপেছিলেন। এঁর প্রতিষ্ঠানে কলকাতার লাহা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণকৃষ্ণ লাহা কেরানির কাজ করতেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)—কলকাতার জোড়াসাঁকোয় জমিদার বংশে জন্ম। ত্রিশ বৎসর বয়সে মারা যান। কিন্তু এই স্বল্পজীবনের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলার ব্যঙ্গ সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। চিৎপুরে পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন।

কাশীনাথ—১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা অক্ষরে ও বাঙালি-অঙ্কিত পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার (১৮০৭-১৮৫০)—পঞ্চানন কর্মকারের দৌহিত্র, ভিতরে ১২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য—প্রথম বাঙালি সাংবাদিক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত, প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা গেজেটি' নামক বাঙালি-সম্পাদিত ও মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। (ভিতরে ২১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)—বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। প্রায় ৮০ খানা নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত ছন্দ 'গৈরিক ছন্দ' নামে স্বীকৃত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (১২৪৪-১৩২৫ বঙ্গাব্দ)—হিন্দু হোস্টেলের সামান্য বাজার-সরকার ছিলেন। ওই হোস্টেলেরই সিঁড়ির কোণে ছাত্রদের কাছে দুর্গাদাস করের প্রসিদ্ধ 'মেটেরিয়া মেডিকা' বিক্রি করে পুস্তক ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন। পরে কলেজ স্ট্রীটে 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি' নামে একটি প্রকাশন সংস্থা স্থাপন করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের নিজস্ব বাড়িতে ব্যবসায় স্থানান্তরিত করে 'গুরুদাস লাইব্রেরি' নাম দেন। তিনি রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলার ইতিহাস',

রজনীকান্ত সেনের ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যগ্রন্থসমূহ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহ প্রকাশ করে বাঙলার বিদ্বজ্জনের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বার্ষিক তিন টাকা মূল্যের মাসিক পত্রিকা 'ভারতবর্ষ' তাঁর অনন্য কীর্তি।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (সেপ্টেম্বর ১৮১৮) প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সংস্থা দুটির পুস্তক প্রকাশনায় সাহায্য করেন। তাঁর রচিত 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' ও তাঁর সঙ্কলিত 'কবিতামৃতকূপ' উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক।

চণ্ডীচরণ মুনসি (১৭০৭-১৮০৮)—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কাদির বখশ রচিত ফারসি গ্রন্থ 'তুতিনামা'র বাংলা অনুবাদ 'তোতার ইতিহাস' নামে প্রকাশ করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়।

চিন্তামণি ঘোষ (১৮৪৪-১৯২৮)—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে একটি হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র কিনে 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ওই ছাপাখানা বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা চালাবার ব্যবস্থা করেন। লিথোগ্রাফি পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলি প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীদের অঙ্কিত বহুবর্ণ চিত্র মুদ্রিত করেন।

জয়নারায়ণ ঘোষাল, মহারাজা (১৭৫২-১৮২০)—ভূকৈলাসের জমিদার। করুণানিধানবিলাস, বোধোদ্দীপন, ব্যবহারমুকুর প্রভৃতি লোকোপকারক বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তাঁকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা-প্রসারের প্রধান পথপ্রদর্শক বলা হয়।

জেমস্ লঙ (রেভারেণ্ড) (১৮১৫-১৮৮৭)। খ্রীষ্টয়ান পাদরি। বাংলা ভাষার বিশেষ অনুরাগী। বাংলা চলতি বচন ও প্রবাদ বাক্যসমূহ সংগ্রহ করে, তিনি দশখানা বই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থমালার একাধিক তালিকাও প্রকাশ করেছিলেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার দরুন তাঁর হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাস জেল হয়েছিল। লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়।

তারাচাঁদ দাস—বটতলার প্রসিদ্ধ প্রকাশক। বহু বাংলা বই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সংস্থা এখনও জীবিত আছে।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)—চাসিদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার অবলম্বনে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলদর্পণ' নাটক লেখেন।

নৃত্যলাল দত্ত—বটতলার প্রাচীন প্রকাশক। দত্ত প্রেসের মালিক। কাঠ খোদাই রঙীন ছবি প্রকাশ করতেন।

নৃত্যলাল শীল—বটতলার স্বনামধন্য প্রধান প্রকাশক।

পঞ্চানন কর্মকার—ভিতরে ১১ পৃষ্ঠা দেখুন।

প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (১৭৬৪—১৮৩৬)—খড়দহের জমিদার। তিনি বহু অর্থ-ব্যয়ে 'প্রাণতোষিণী', 'বৈষ্ণবামৃত', 'বিষ্ণুকৌমুদী,' 'ভাস্কৌমুদী', 'শব্দাম্বুধি 'ক্রিয়াম্বুধি', 'ঔষধাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি 'শব্দাম্বুধি' প্রকাশ করেছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)—'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করে বাংলা সাহিত্য রচনায় কথ্যভাষা ব্যবহারের সম্ভাব্যতা প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রধান পুরুষ। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা। বাংলার উপন্যাস সম্রাট। (পরিশিষ্ট 'খ' দেখুন)।

বিশ্বনাথ দেব—১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শোভাবাজার রাজবাটীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে স্বল্পমূল্যে পুস্তকাদি প্রচার করেন। তাঁকে বটতলা প্রকাশন-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭—১৮৫৮)—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি কলুটোলায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে 'সমাচারচন্দ্রিকা' নামে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুখপত্র হিসাবে এক পত্রিকা বের করেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি এ দেশের শিল্পবাণিজ্যে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের ও বিদেশী প্রথার বিরোধিতা করেন। তিনি 'কলিকাতা কমলালয়' ',নববিবি-বিলাস,' 'দূতী-

বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে তৎকালীন কলকাতা-সমাজের দুর্নীতির মুখোস খুলে দেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কলকাতায় 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন ও বহু প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করে মুদ্রিত করেন। তাঁর রচিত 'শিশু-শিক্ষা' (তিন ভাগ) বহুদিন এদেশের বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হত।

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)—'এই মহাকবির সাধনায় বাংলা কাব্য সাহিত্যে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত হয়।' বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

মনোহর কর্মকার—পঞ্চানন কর্মকারের জামাতা। শ্বশুরের নিকট হতে ছেনিকাটা শিখে, শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে নিযুক্ত থাকেন ও অনেকগুলি ভারতীয় ভাষার হরফের সাট তৈরি করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে বহু ইংরেজি, বাংলা বই ও পঞ্জিকা প্রকাশ করেন।

ম্যানোএল দ্য আসসুম্পসাঁম—পর্তুগীজ পাদরি। বাংলায় এসে বাংলা ভাষা শেখেন। তিনখানি বাংলা বই লেখেন—ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ। তিনখানি বইই রোমান হরফে লিসবন থেকে প্রকাশিত। বইগুলি দ্বিভাষিক—এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ অনুবাদ।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত। বাংলা মুদ্রণের প্রথম যুগের বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, বেদান্তচন্দ্রিকা, রাজাবলি, প্রবোধচন্দ্রিকা প্রভৃতি পুস্তকসমূহের লেখক।

যোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬০-১৮৩৭)—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসে শ্রীরামপুর মিশনকে কেন্দ্র করে মিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি স্কুল খুলেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য দুরূহ চীনাভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচারদর্পণ' নামে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কেরির মৃত্যুর পর ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শ্রীরামপুর মিশনের নেতৃত্ব করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৪-১৯০৫)—'বঙ্গবাণী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য, বাংলা অনুবাদ সহ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও সুলভ মূল্যে বিক্রয় তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)—বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মনীষী ও বিশ্ববিখ্যাত কবি। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান। (পরিশিষ্ট 'খ' দেখুন)।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)—সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ্ ও সিভিলিয়ান। বাংলায় ঋগ্বেদের অনুবাদ করেন।

রস, জন ম্যাথিয়াস—চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্নর ও হ্যালহেডের শ্বশুর।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরির সহকারী। তাঁর লেখা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয় ও ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)—তাঁর জীবিত কালে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে গণ্য হতেন। বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা'র জন্য কামন্দক-কৃত 'নীতিসার' সম্পাদন করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে এক সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। 'এই পত্রিকায় পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য ব্যাপার ও জীব সংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা থাকত।'

রাধাকান্ত দেব (১৭৮১-১৮৬৭)—মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌত্র। "৪০ বছরের পরিশ্রমে প্রস্তুত ৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর সংস্কৃতে জ্ঞান, অধ্যবসায় ও শ্রমশক্তির পরিচায়ক এবং তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি।"

রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪)—১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ড. উইলিয়াম হাণ্টারের 'হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেস'-এ কম্পোজিটর হিসাবে ঢোকেন ও পরে অধ্যক্ষ হন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে টাঁকশালের দেওয়ান হন। তাঁর সঙ্কলিত 'ইংরেজি-বাংলা অভিধান' দেশীয় লোকের সম্পাদিত প্রথম অভিধান।

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

তাঁর রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' শ্রীরামপুর হতে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম মৌলিক মুদ্রিত গ্রন্থ। তিনি 'লিপিমালা' নামে একখানা বইও রচনা করেছিলেন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮০৬)—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক লিখে পুরস্কৃত হন।

শরৎকুমার লাহিড়ী—রামতনু লাহিড়ীর পুত্র। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ ষ্ট্রীটে পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করেন। সংস্থার নাম 'এস. কে. লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানি'। হেমচন্দ্র সুরের 'ইংরেজি-বাংলা অভিধান' প্রকাশ করেন।

সত্যব্রত সামশ্রমী (১৮৪৬-১৯১১)—প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত ও বেদ-প্রচারক। আট বছর কাল (১৮৬৭-১৮৭৪) কাশী থেকে 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার জন্য সামবেদ সংহিতা সম্পাদন করেন। বেদপ্রচারের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন ও নিজ তত্ত্বাবধানে বহু প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন ও অনুবাদ করেন।

হরচন্দ্র রায়—৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীটে 'বেঙ্গলি প্রিন্টিং প্রেস' নামে এক ছাপাখানা স্থাপন করেন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'র তিনি প্রকাশক ছিলেন।

হানা ক্যাথেরিন ম্যালেন্‌স্‌—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদেশিনী মহিলা 'ফুলমণি ও করুণার কাহিনী' নামক প্রথম বাংলা উপন্যাস প্রকাশ করেন।

হিকি, জেমস অগাষ্টস—১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা তথা ভারতে প্রথম সংবাদপত্র ('বেঙ্গল গেজেট') প্রকাশ করেন।

হ্যালহেড, নাথানিয়াল ব্রাশি—ভিতরে ৯ পৃষ্ঠা দেখুন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ফিরে যান ও ১৭৯১-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফেলিকস্‌ কেরি—ইনি উইলিয়াম কেরির পুত্র। ইনি 'বিদ্যাহারাবলী' (দুই খণ্ডে) নামক বাংলা ভাষায় প্রথম জ্ঞানকোষ রচনা করেন।

পরিশিষ্ট খ

বাংলা সাহিত্যের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

বাংলা সাহিত্যের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হচ্ছেন—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। এই তিনজন লেখকের রচনাসমূহ ও পুস্তকাকারে তাদের প্রথম প্রকাশের তারিখ আমরা নীচে দিচ্ছি—

বঙ্কিমচন্দ্র : ললিতা ১৮৫৬, দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫, কপালকুণ্ডলা ১৮৬৬, মৃণালিনী ১৮৬৯, বিষবৃক্ষ ১৮৭৩, ইন্দিরা ১৮৭৩, যুগলাঙ্গুরীয় ১৮৭৪, লোকরহস্য ১৮৭৫, বিজ্ঞানরহস্য ১৮৭৫, চন্দ্রশেখর ১৮৭৫, কমলাকান্তের দপ্তর ১৮৭৬, বিবিধ সমালোচনা ১৮৭৬, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ১৮৭৭, রজনী ১৮৭৭, উপকথা ১৮৭৭, কবিতা পুস্তক ১৮৭৮, কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৮, সাম্য ১৮৭৯, প্রবন্ধপুস্তক ১৮৮১, রাজসিংহ ১৮৮২, আনন্দমঠ ১৮৮২, মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত ১৮৮৪, দেবী চৌধুরাণী ১৮৮৪, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস ১৮৮৬, রাধারাণী ১৮৮৬, কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগ ১৮৮৬, সীতারাম ১৮৮৭, বিবিধ প্রবন্ধ ১৮৮৭, ধর্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ ১৮৮৮, বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯২, সহজ রচনাশিক্ষা ১৮৯৪, সহজ ইংরেজি শিক্ষা ১৮৯৪, শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৯০২।

রবীন্দ্রনাথ : (তারিখ বঙ্গাব্দে প্রদত্ত)—কবি কাহিনী ১২৮৫, বনফুল ১২৮৬, বাল্মীকি-প্রতিভা (ফাল্গুন ১৮০২ শক), ভগ্নহৃদয় ১২৮৮, য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র ১২৮৮, সন্ধ্যাসংগীত ১২৮৮, কালমৃগয়া ১২৮৯, বউ ঠাকুরাণীর হাট ১২৯০, প্রভাতসংগীত ১২৯০, বিবিধ প্রসঙ্গ ১২৯০, ছবি ও গান ১২৯০, প্রকৃতির প্রতিশোধ ১২৯১, নলিনী ১২৯১, শৈশব সংগীত ১২৯১, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১২৯১, রামমোহন রায় ১২৯১, আলোচনা ১২৯২, রবিচ্ছায়া ১২৯২, কড়ি ও কোমল ১২৯৩, রাজর্ষি ১২৯৩, চিঠিপত্র ১২৯৩, সমালোচনা ১২৯৪, মায়ার খেলা ১২৯৪, রাজা ও রাণী ১২৯৬, বিসর্জন ১২৯৭, মন্ত্রি অভিষেক ১২৯৭, মানসী ১২৯৭, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ১২৯৮, চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯, গোড়ায় গলদ ১২৯৯, গানের বহি ১২৯৯, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি দ্বিতীয় খণ্ড ১৩০০,

সোনার তরী ১৩০০, ছোট গল্প ১৩০০, বিচিত্র গল্প প্রথম ভাগ ১৩০১, কথা-চতুষ্টয় ১৩০১, গল্পদশক ১৩০২, নদী ১৩০২, চিত্রা ১৩০২, বৈকুণ্ঠের খাতা ১৩০৩, পঞ্চভূত ১৩০৫, কণিকা ১৩০৬, কথা ১৩০৬, কাহিনী ১৩০৬, কল্পনা ১৩০৭, ক্ষণিকা ১৩০৭, গল্পগুচ্ছ ১৩০৭, নৈবেদ্য ১৩০৭, উপনিষদ ব্রহ্ম ১৩০৮, চোখের বালি ১৩০৯, কর্মফল ১৩১০, আত্মশক্তি ১৩১২, স্বদেশ ১৩১২, বাউল ১৩১২, ভারতবর্ষ ১৩১২, খেয়া ১৩১৩, নৌকাডুবি ১৩১৩, বিচিত্র প্রবন্ধ ১৩১৪, চারিত্র পূজা ১৩১৪, প্রাচীন সাহিত্য ১৩১৪, লোকসাহিত্য ১৩১৪, সাহিত্য ১৩১৪, আধুনিক সাহিত্য ১৩১৪, হাস্যকৌতুক ১৩১৪, ব্যঙ্গকৌতুক ১৩১৪, প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩১৪, সভাপতির অভিভাষণ ১৩১৪, প্রহসন ১৩১৫, রাজা প্রজা ১৩১৫, সমূহ ১৩১৫, স্বদেশ ১৩১৫, সমাজ ১৩১৫, কথা ও কাহিনী ১৩১৫, শারদোৎসব ১৩১৫, গান ১৩১৫, শিক্ষা ১৩১৫, মুকুট ১৩১৫, শব্দতত্ত্ব ১৩১৫, ধর্ম ১৩১৫, প্রায়শ্চিত্ত ১৩১৬, বিদ্যাসাগর চরিত ১৩১৬, চয়নিকা ১৩১৬, শিশু ১৩১৬, গান ১৩১৬, গোরা ১৩১৬, গীতাঞ্জলি ১৩১৭, রাজা ১৩১৭, শান্তিনিকেতন ১৩১৫, ১৬, ১৭, ১৮, আটটি গল্প ১৩১৮, ডাকঘর ১৩১৮, গল্প চারিটি ১৩১৮, মালিনী ১৩১৮, চৈতালি ১৩১৮, বিদায় অভিশাপ ১৩১৯, জীবনস্মৃতি ১৩১৯, ছিন্নপত্র ১৩১৯, অচলায়তন ১৩১৯, স্মরণ ১৩২০, উৎসর্গ ১৩২১, গীতিমালা ১৩২১, গীতালি ১৩২১, শান্তিনিকেতন ১৩২২, ফাল্গুনী ১৩২২, ঘরে-বাইরে ১৩২৩, সঞ্চয় ১৩২৩, পরিচয় ১৩২৩, বলাকা ১৩২৩, চতুরঙ্গ ১৩২৩, গল্পসপ্তক ১৩২৩, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪, গুরু ১৩২৪, পলাতকা ১৩২৪, জাপান যাত্রী ১৩২৬, অরূপরতন ১৩২৬, পয়লা নম্বর ১৩২৭, ঋণশোধ ১৩২৮, মুক্তধারা ১৩২৯, লিপিকা ১৩২৯, শিশু ভোলানাথ ১৩২৯, বসন্ত ১৩২৯, পূরবী ১৩৩২, সংকলন ১৩৩২, গৃহপ্রবেশ ১৩৩২, প্রবাহিনী ১৩৩২, চিরকুমার সভা ১৩৩২, গীতচর্চা ১৩৩২, শোধবোধ ১৩৩৩, নটীর পূজা ১৩৩৩, রক্তকরবী ১৩৩৩, ঋতু উৎসব ১৩৩৩, লেখন ১৩৩৪, ঋতুরূপ ১৩৩৪, শেষরক্ষা ১২৩৫, যাত্রী ১৩৩৬, পরিত্রাণ ১৩৩৬, যোগাযোগ ১৩৩৬, তপতী ১৩৩৬, মহুয়া ১৩৩৬, ভানুসিংহের পত্রাবলী ১৩৩৬, নবীন ১৩৩৭, রাশিয়ার চিঠি ১৩৩৮, বনবাণী ১৩৩৮, গীতবিতান ১৩৩৮, শাপমোচন ১৩৩৮, সঞ্চয়িতা ১৩৩৮, পরিশেষ ১৩৩৯, কালের যাত্রা ১৩৩৯, পুনশ্চ ১৩৩৯, দুইবোন ১৩৩৯, মানুষের ধর্ম ১৩৪০, বিচিত্রিতা ১৩৪০, চণ্ডালিকা

১৩৪০, তাসের দেশ ১৩৪০, বাঁশরি ১৩৪০, ভারতপথিক রামমোহন রায় ১৩৪০, মালঞ্চ ১৩৪০, শ্রাবণ গাথা ১৩৪১, চার অধ্যায় ১৩৪১, শান্তিনিকেতন ১৩৪১, শেষ সপ্তক ১৩৪২, সুর ও সঙ্গতি ১৩৪২, বীথিকা ১৩৪২, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ১৩৪২, পত্রপুট ১৩৪৩, ছন্দ ১৩৪৩, জাপানে-পারস্যে ১৩৪৩, শ্যামলী ১৩৪৩, সাহিত্যের পথে ১৩৪৩, পাশ্চাত্য ভ্রমণ ১৩৪৩, প্রাক্তনী ১৩৪৩, খাপছাড়া ১৩৪৩, কালান্তর ১৩৪৪, সে ১৩৪৪, ছড়ার ছবি ১৩৪৪, বিশ্বপরিচয় ১৩৪৪, প্রান্তিক ১৩৪৪, চণ্ডালিকা ১৩৪৪, পথে ও পথের প্রান্তে ১৩৪৫, সেঁজুতি ১৩৪৫, বাংলা ভাষাপরিচয় ১৩৪৫, পত্রধারা ১৩৪৫, প্রহাসিনী ১৩৪৫, আকাশ-প্রদীপ ১৩৪৬, শ্যামা ১৩৪৬, পথের সঞ্চয় ১৩৪৬, নবজাতক ১৩৪৭, সানাই ১৩৪৭, ছেলেবেলা ১৩৪৭, চিত্রলিপি ১৩৪৭, তিন সঙ্গী ১৩৪৭, রোগশয্যায় ১৩৪৭, আরোগ্য ১৩৪৭, জন্মদিনে ১৩৪৮, গল্পসল্প ১৩৪৮, সভ্যতার সংকট ১৩৪৮, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ১৩৪৮, ছড়া ১৩৪৮, শেষ লেখা ১৩৪৮, চিঠিপত্র ১৩৪৯, আত্মপরিচয় ১৩৫০, সাহিত্যের স্বরূপ ১৩৫০, চিঠিপত্র ১৩৫০, স্ফুলিঙ্গ ১৩৫২, চিঠিপত্র ১৩৫২, মহাত্মা গান্ধী ১৩৫৪, মুক্তির উপায় ১৩৫৫, বিশ্বভারতী ১৩৫৮, বৈকালী ১৩৫৮, চিত্র লিপি ১৩৫৮, সমবায়-নীতি ১৩৬০, ইতিহাস ১৩৬২, বুদ্ধদেব ১৩৬৩, চিঠিপত্র ১৩৬৪, খৃষ্ট ১৩৬৬, ছিন্নপত্রাবলী ১৩৬৭, বিচিত্রা ১৩৬৮, দীপিকা ১৩৭০, রূপান্তর ১৩৭২, সংগীত চিন্তা ১৩৭৩।

শরৎচন্দ্র : বড়দিদি ১৯১৩, বিরাজ বৌ ১৯১৪, বিন্দুর ছেলে ১৯১৪, পরিণীতা ১৯১৪, পণ্ডিত মশায় ১৯১৪, মেজদিদি ১৯১৫, পল্লীসমাজ ১৯১৬, চন্দ্রনাথ ১৯১৬, বৈকুণ্ঠের উইল ১৯১৬, অরক্ষণীয়া ১৯১৬, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব ১৯১৭, দেবদাস ১৯১৭, নিষ্কৃতি ১৯১৭, কাশীনাথ ১৯১৭, চরিত্রহীন ১৯১৭, স্বামী ১৯১৮, দত্তা ১৯১৮, শ্রীকান্ত ২য় পর্ব ১৯১৮, ছবি ১৯২০, গৃহদাহ ১৯২০, বামুনের মেয়ে ১৯২০, দেনাপাওনা ১৯২৩, নববিধান ১৯২৫, হরিলক্ষ্মী ১৯২৬, পথের দাবী ১৯২৬, শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব ১৯২৭, তরুণের বিদ্রোহ ১৯২৯, শেষ প্রশ্ন ১৯৩১, স্বদেশ ও সাহিত্য ১৯৩২, শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব ১৯৩৩, অনুরাধা ১৯৩৪, সতী ও পরেশ ১৯৩৪, বিপ্রদাস ১৯৩৫। ছদ্মনামে লেখা 'মন্দির' ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, নারীর মূল্য ১৯২৪, শেষের পরিচয় অসমাপ্ত উপন্যাস শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সম্পূর্ণ করেন।